অকারাদি বর্ণক্রমে অষ্টম কল্পের চতুর্থ ভাগের সূচী পত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ
প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা।
বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আ
সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৬। ১ চৈত্র রবিবার।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অষ্টম কল্পের চতুর্থ ভাগের সূচী পত্র

Registered No 58

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

তৈত্তিরীয়োপনিষৎ।

ভৃগুবল্লী।

দশম অনুবাক।

ন কঞ্চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত। তদ্ব্রতং। তস্মাদ্‌যয়া কয়া চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্নমিত্যাচক্ষতে। ১।

'বসতৌ' বসতিনিমিত্তং 'কঞ্চন' কঞ্চিদপি 'ন প্রত্যাচক্ষীত' বসত্যর্থমাগতং ন নিবারয়েৎ বাসে চ দত্তেঽবশ্যং হ্যসনং দাতব্যং 'তৎ ব্রতং' 'তস্মাৎ' 'যয়া কয়া চ বিধয়া' যেন কেন প্রকারেণ 'বহ্বন্নং প্রাপ্নুয়াৎ' বহ্বন্নসংগ্রহং কুর্য্যাৎ। অন্নবন্তো বিদ্বাংসোঽভ্যাগতায়ান্নার্থিনে 'অরাধি' সংসিদ্ধং 'অস্মৈ অন্নং ইতি আচক্ষতে' ন নাস্তীতি প্রত্যাখ্যানং কুর্ব্বন্তি। ১।

বসতির নিমিত্ত কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করিবেক না, ইহাই ব্রত, অতএব যে কোন প্রকারে হউক বহু অন্ন সংগ্রহ করিবেক, অর্থিকে অন্ন সংসিদ্ধ কহিবেক, নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিবেক না। ১।

এতদ্বৈ মুখতোঽন্নং রাদ্ধং। মুখতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্বৈ মধ্যতোঽন্নং রাদ্ধং। মধ্যতোঽস্মা অন্নং রাধ্যতে। য এবং বেদ। ২।

'এতদ্বৈ' 'অন্নং' 'মুখতঃ' মুখ্যে প্রথমে বয়সি অর্থিনে 'রাদ্ধং' সংসিদ্ধং প্রযচ্ছতি। 'মুখতঃ' প্রথমে বয়সি 'অস্মৈ' অন্নদায় 'অন্নং' 'রাধ্যতে' যথাদত্তমুপতিষ্ঠতে। এবং 'মধ্যতঃ' মধ্যমে বয়সি 'অস্মৈ' 'অন্নং' 'রাধ্যতে' সংসিদ্ধতি। 'যঃ এবং বেদ'। ২।

প্রথম বয়সে অর্থিকে অন্নদান করিবেক, প্রথম বয়সেই তাহার অন্ন উপস্থিত হইবেক। মধ্যম বয়সে অর্থিকে অন্ন দান করিবেক, মধ্যম বয়সেই তাহার অন্ন উপস্থিত হইবেক। যিনি এইরূপ জানেন। ২।

ক্ষেমইতি বাচি। যোগক্ষেমইতি প্রাণাপানয়োঃ। কর্ম্মেতি হস্তয়োঃ। গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজ্ঞাঃ। ৩।

ইদানীং ব্রহ্মোপাসনপ্রকারমুচ্যতে। 'ক্ষেমঃ ইতি বাচি' ক্ষেমঃ নাম উপাত্তপরিরক্ষণং বাচি ক্ষেমরূপেণ প্রতিষ্ঠিতমিতি ব্রহ্ম উপাস্যং। 'যোগক্ষেমঃ ইতি' যোগোঽনুপাত্তস্যোপাদানং, 'প্রাণাপানয়োঃ' ব্রহ্ম যোগক্ষেমাত্মনা প্রতিষ্ঠিতমিত্যুপাস্যং। 'গতিরিতি পাদয়োঃ বিমুক্তিরিতি পায়ৌ' 'ইতি' এতাঃ 'মানুষীঃ' মনুষ্যেষু ভবাঃ আধ্যাত্মিক্যঃ 'সমাজ্ঞাঃ' জ্ঞানানি বিজ্ঞানানি উপাসনানীত্যর্থঃ। ৩।

প্রাপ্ত বিষয়ের রক্ষা রূপে বাক্যেতে প্রতিষ্ঠিত ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক, অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি রূপে প্রাণাপানে প্রতিষ্ঠিত ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক, পাদদ্বয়ে গতি রূপে এবং পায়ুদেশে বিমুক্তি রূপে প্রতিষ্ঠিত ভাবে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক, ইহাই মনুষ্যের আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিজ্ঞান উপাসনা। ৩।

অথ দৈবীঃ। তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি। যশইতি পশুষু। জ্যোতিরিতি নক্ষত্রেষু। প্রজাতিরমৃতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সর্ব্বমিত্যাকাশে। ৪।

'অথ' অনন্তরং 'দৈবীঃ' দেবেষু ভবাঃ সমাজ্ঞাঃ উচ্যন্তে 'তৃপ্তিরিতি বৃষ্টৌ' বৃষ্টেরন্নাদিদ্বারেণ তৃপ্তিহেতুত্বাৎ ব্রহ্মৈব তৃপ্ত্যাত্মনা বৃষ্টৌ ব্যবস্থিতমিত্যুপাস্যং। তথা 'বলমিতি বিদ্যুতি যশইতি পশুষু জ্যোতিঃ ইতি নক্ষত্রেষু', 'প্রজাতিরমৃতং' অমৃতত্বপ্রাপ্তিঃ পুত্রেণ ঋণমোক্ষদ্বারেণ 'আনন্দঃ' সুখং 'ইতি' এতৎ সর্ব্বং 'উপস্থে' উপস্থনিমিত্তং প্রতিষ্ঠিতং ব্রহ্মেত্যুপাস্যং। সর্ব্বং হ্যাকাশে প্রতিষ্ঠিতং অতোযৎ 'সর্ব্বমাকাশে' তৎ ব্রহ্মেতি উপাস্যং। ৪।

অনন্তর দেবতাতে জ্ঞান বিজ্ঞান উপাসনা। বৃষ্টিতে তৃপ্তি রূপে, বিদ্যুতে বল রূপে, পশুতে যশ রূপে, নক্ষত্রে জ্যোতি রূপে, উপস্থে প্রজা, মুক্তি ও আনন্দ রূপে এবং আকাশে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত বস্তু রূপে ব্রহ্মের উপাসনা করিবেক। ৪।

তৎ প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান্ ভবতি। তন্মহইত্যুপাসীত। মহান্ ভবতি। তন্মনইত্যুপাসীত। মানবান্ ভবতি। ৫।

তস্মাৎ 'তৎ' ব্রহ্ম সর্ব্বস্য 'প্রতিষ্ঠা ইতি উপাসীত' প্রতিষ্ঠাগুণোপাসনাৎ 'প্রতিষ্ঠাবান্' উপাসকঃ 'ভবতি' এবমুত্তরেষ্বপি। 'মহঃ' মহত্ত্বগুণবৎ। 'মনঃ' মননং 'মানবান্' মননসমর্থঃ। ৫।

ব্রহ্মকে সকলের প্রতিষ্ঠা রূপে উপাসনা করিবেক, উপাসক প্রতিষ্ঠাবান্ হইবেক। ব্রহ্মকে মহৎ রূপে উপাসনা করিবেক, উপাসক মহান্ হইবেক। ব্রহ্মকে মনন রূপে উপাসনা করিবেক, উপাসক মনন সমর্থ হইবেক। ৫।

তন্নমইত্যুপাসীত। নম্যন্তেঽস্মৈ কামাঃ। তদ্ব্রহ্মেত্যুপাসীত। ব্রহ্মবান্ ভবতি। তদ্ব্রহ্মণঃ পরিমরইত্যুপাসীত। পর্য্যেণ ম্রিয়ন্তে দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ। পরি যেঽপ্রিয়া ভ্রাতৃব্যাঃ। সযশ্চায়ং পুরুষে। যশ্চাসাবাদিত্যে। সএকঃ। ৬।

'তৎ' ব্রহ্ম 'নমঃ' নমনং নমনগুণবৎ 'ইতি উপাসীত' 'নম্যন্তে' প্রহ্বীভবন্তি 'অস্মৈ' উপাসিত্রে 'কামাঃ' কাম্যন্তইতি ভোগ্যাঃ বিষয়াঃ। 'তৎ ব্রহ্মেতি উপাসীত' ব্রহ্ম পরিবৃঢ়তমমিত্যুপাসীত 'ব্রহ্মবান্' তদ্গুণঃ ভবতি। 'তৎ' 'ব্রহ্মণঃ' 'পরিমরঃ ইতি' বায়ুঃ বায়বাত্মানং 'উপাসীত' এবংবিদং 'দ্বিষন্তঃ সপত্নাঃ' 'পরি ম্রিয়ন্তে' প্রাণান্ জহতি কিঞ্চ 'যেঽপ্রিয়াঃ ভ্রাতৃব্যাঃ' তে চ 'পরি' ম্রিয়ন্তে। শেষং পূর্ব্ববৎ। ৬।

ব্রহ্মকে নম রূপে উপাসনা করিবেক, সকল ভোগ্য বিষয় তাঁহার নিকট প্রণত হইবেক। তাঁহাকে ব্রহ্ম রূপে উপাসনা করিবেক, উপাসক ব্রহ্মবান্ হইবেক। ব্রহ্মের পরিমর ভাবে উপাসনা করিবেক, তাঁহার বিদ্বেষী শত্রুরা ও অপ্রিয় ভ্রাতৃব্যেরা প্রাণত্যাগ করিবেক। যিনি এই পুরুষে যিনি এই আদিত্যে তিনি একই মাত্র। ৬।

সযএবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং মনোময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য। ইমান্ লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্। ৭।

'সঃ যঃ এবং বিৎ অস্মাৎ লোকাৎ' 'প্রেত্য' প্রত্যাবৃত্য সর্ব্বং অন্নময়াদিক্রমেণানন্দময়াত্মানমুপসংক্রম্য 'ইমান্ লোকান্' ভূরাদীন্ 'কামান্নী' কামতোঽন্নমস্যেতি 'কামরূপী' 'অনুসঞ্চরন্' সর্ব্বাত্মনা ইমান্ লোকান্ আত্মত্বেনানুভবন্। ৭।

যে ব্যক্তি এই রূপ জানেন, তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়া এই অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় আত্মাতে সংযুক্ত ভাবে যথাকাম অন্ন প্রাপ্ত ও কামরূপী হইয়া এই সকল লোকে সঞ্চরণ করেন। ৭।

এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা ৩ বু হা ৩ বু হা ৩ বু। অহমন্ন ১ মহমন্ন ১ মহমন্নং ১। অহমন্নাদো ২ ঽহমন্নাদো ২ ঽহমন্নাদঃ। অহং শ্লো ১ ককৃদহং শ্লো ১ ককৃদহং শ্লো ১ ককৃৎ। অহমস্মি প্রথমজা ঋতা ৩ স্য। পূর্ব্বন্দেবেভ্যোঽমৃতস্য না ৩ ভাযি। যোমাদদাতি সইদেব মা ৩ বাঃ। অহমন্নমন্নমদন্তমা ৩ দ্মি। অহং বিশ্বং ভুবনমভ্য-

ভবাং ৩। সুবর্ণজ্যোতীঃ। যএবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ। ৮।

'এতৎ' 'সাম' সমত্বাৎ ব্রহ্মৈব সাম 'গায়ন্' আত্মৈকত্বং প্রখ্যাপয়ন্ 'আস্তে' তিষ্ঠতি। কিং তৎ সাম 'হাবু হাবু হাবু' অত্যন্তবিস্ময়খ্যাপনার্থঃ; অদ্বৈতআত্মা নিরঞ্জনোপি সন্ অহমেবান্নমন্নাদশ্চ, কিঞ্চাহমেব 'শ্লোককৃৎ' শ্লোকোনাম অন্নান্নাদয়োঃ সঙ্ঘাতকর্ত্তা, ত্রিরুক্তির্ব্বিস্ময়খ্যাপনার্থা। 'অহং' 'অস্মি' ভবামি 'প্রথমজঃ' প্রথমোৎপন্নঃ 'ঋতস্য' সত্যস্য মূর্ত্তামূর্ত্তস্য জগতঃ 'দেবেভ্যঃ' চ 'পূর্ব্বং' 'অমৃতস্য' 'নাভিঃ' মধ্যং, 'যঃ' কশ্চিৎ 'মা' মাং অন্নং অন্নার্থিভ্যঃ 'দদাতি' প্রয়চ্ছতি 'সঃ' 'ইৎ' ইতঃ 'এবং' মাং 'আবাঃ' অবতীত্যর্থঃ, কিঞ্চ 'অন্নং অদন্তং' ভক্ষয়ন্তং পুরুষং প্রতি 'অস্মি' ভোজয়ামি 'অহং' 'বিশ্বং' সমস্তং 'ভুবনং' 'অভ্যভবাং' অভিভবামি 'সুবঃ' আদিত্যঃ 'ন' ইব 'জ্যোতিঃ' 'যঃ' 'এবং' উপনিষদং 'বেদ' তস্য যথোক্তং ফলমিতি। ৮।

তিনি এই রূপ সাম গান করেন, এবং অত্যন্ত বিস্ময় জনক বাক্য বলেন, যে আমিই অন্ন, আমিই অন্নের ভোক্তা, আমিই অন্নাদির কর্ত্তা, আমি সত্যের প্রথম এবং দেবতাদিগের পূর্ব্বে জন্মিয়াছি, আমিই অমৃতের নাভি, যে আমাকে অর্থিকে দান করে, সে আমাকে এখান হইতে রক্ষা করে, যে অন্ন ভোজন করে আমি তাহাকে প্রতি-ভোজন করি, আমি সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় সমস্ত ভুবনকে পরাভব করি। যিনি এই প্রকার উপনিষৎ জানেন, তিনি যথোক্ত ফল প্রাপ্ত হয়েন, ইহাই উপনিষৎ। ৮।

ইতি তৈত্তিরীয়োপনিষৎ সমাপ্তা।

বেদান্ত-দর্শন।

পরমাত্মা প্রকৃতির অধীশ্বর, জীবাত্মা প্রকৃতির অধীন, এই যাহা ইতি-পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, ইহার মর্ম্ম স্থির চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখা আবশ্যক।

বেদান্ত বলেন যে ঐশী-শক্তি বা মায়া শুদ্ধ-সত্ত্ব, এবং অবিদ্যা মলিন-সত্ত্ব। এই কথাটির তাৎপর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই উক্ত বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারিবে।

শক্তি, যখন, কার্য্যে পরিণত হয়, তখন প্রকাশ্য বিষয় কতক প্রকাশিত হয়, কতক প্রচ্ছন্ন থাকে, কতক প্রকাশোন্মুখ থাকে। সমস্ত প্রকাশ্য বিষয় যদি একেবারেই প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে এক মুহূর্ত্তেই কার্য্যের অবসান হয়, সুতরাং তেমন করিয়া কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না; বৃক্ষের মূল শাখা পত্র পুষ্প ফল, একই অব্যবহিত মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইতে পারে না। কবি যদি অন্তঃকরণের সকল ভাব এক-কালেই প্রকাশ করিতে যান, তাহা হইলে সে ভাব ভাব-মাত্রই থাকিয়া যায়; আবির্ভাব হয় না। কবি আপনার প্রকাশ্য-বিষয় আপাততঃ অপ্রকাশ রাখিয়া ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিলে, তবেই তাহা কাব্য রূপে আবির্ভূত হয়।

সকল ভাব একেবারে প্রকাশ করিলে যেমন কার্য্য হয় না, সকল ভাব অপ্রকাশ রাখিলেও কার্য্য হয় না। কার্য্য উৎপন্ন করিতে হইলে প্রকাশ চাই, অপ্রকাশ চাই, তদ্ব্যতীত অপ্রকাশ হইতে প্রকাশ, উভয়ের মধ্যে এই যে ব্যবধান-রাহিত্য বা সংশ্লিষ্ট ভাব, ইহাও চাই।

এই হেতু সাংখ্য দর্শন বলেন যে, প্রকৃতি (কার্য্যোৎপাদনই যাহার কার্য্য, তাহা) সত্ত্বগুণ অর্থাৎ প্রকাশ-গুণ, তমোগুণ অর্থাৎ অপ্রকাশ-গুণ, এবং উভয়-সংশ্লিষ্ট রজোগুণ এই তিন গুণের আলয়-স্বরূপ। প্রকৃতি প্রকাশ হইতে-যাইতেছে, কিন্তু প্রকাশের বিরোধী-গুণ-দ্বয় কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইতে পারিতেছে না; অপ্রকাশ হইতে-যাইতেছে, তাহাও তদ্বিরোধী গুণ-দ্বয়ের প্রতিবন্ধকতা বশতঃ পারিতেছে না; উদ্যম করিতে-যাইতেছে, তাহাও তদ্বিরোধী (অর্থাৎ রজোগুণের বিরোধী) গুণ-দ্বয়ের প্রতিবন্ধকতা প্রযুক্ত পারিতেছে না; তিন গুণের এইরূপ সাম্যাবস্থা যতক্ষণ

থাকে, ততক্ষণ প্রকৃতি হইতে কোন কার্য্য উৎপন্ন হইতে পারে না, ততক্ষণ প্রকৃতি শক্তিমাত্র-রূপে বর্ত্তমান থাকে। পরন্তু যখন এক দিকে সত্ত্ব-গুণের আধিক্য হয়, অন্য দিকে রজোগুণের আধিক্য হয়, অন্য দিকে তমোগুণের আধিক্য হয়, এই রূপে গুণ-ত্রয়ের বৈষম্য উপস্থিত হয়, তখনই কার্য্য আবিষ্কৃত হয়। সাংখ্যের এই যে মত ইহা বেদান্তের তাবৎ মাত্র গ্রাহ্য যাবৎ না বেদান্তের মূল মতের সহিত তাহার বিরোধ হয়।

বেদান্তের মতে প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, প্রকৃতি ঈশ্বরের শক্তি মাত্র। ঈশ্বর আপনার ভাব অবাধে প্রকাশ করিতেছেন, ঈশ্বরের প্রকাশ-শক্তির কিছুমাত্র বাধা নাই। অতএব প্রকৃতিকে যখন ঈশ্বরের প্রকাশ-শক্তি রূপে দেখা যায়, তখন তাহা বিশুদ্ধ সত্ত্ব-গুণ রূপে প্রতিভাত হয়। ঈশ্বরের নিকট, যেমন ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সমস্তই প্রকাশিত রহিয়াছে, অন্যত্রও সেইরূপ সর্ব্বাংশে সকল ভাব প্রকাশিত থাকিলে যে হেতু জগৎ উৎপন্ন হইতে পারে না, এই হেতু ঈশ্বর সেই প্রকাশ-শক্তিকে বাধা-শক্তি দ্বারা নিয়মিত করিয়া জগৎ উৎপন্ন করিলেন। জগতে ঈশ্বরের ভাব কতক মাত্রই প্রকাশ পায়, অবশিষ্ট অংশ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। প্রকাশ কাহার? না ঈশ্বরের; বাধা কাহার? না জীবের। প্রকাশ-শক্তিও ঈশ্বরের, প্রকাশও ঈশ্বরের; বাধা-শক্তি ঈশ্বরের, কিন্তু বাধা জীবের। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকাশ-শক্তির ধর্ম্মই এই যে তাহা আপনাকে প্রকাশ এবং প্রতি-প্রকাশ করে; বাধা শক্তির ধর্ম্মই এই যে তাহা অন্যকে বাধা দেয়। দীপালোক আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতেছে, ইহা সত্য; কিন্তু প্রাচীর আপনাকে আপনি বাধা দিতেছে ইহা সত্য নহে। ঈশ্বর আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতেছেন, ইহাই সঙ্গত; তিনি যে আপনাকে আপনি বাধা দিতেছেন ইহ সঙ্গত নহে। ঈশ্বর বাধা-বিহীন-রূপে আপনাতে আপনি প্রকাশ পাইতেছেন; ইহা ব্যতীত তাঁহার যে, বাধা-যুক্ত প্রকাশ, তাহা জীবে জীবে অবস্থিতি করিতেছে। আলোক যেমন দ্রব্যাদিতে কতক উপহিত এবং কতক প্রতিবিম্বিত বা প্রতিফলিত হয়, সেই রূপ জীবে জীবে পরমাত্মার প্রকাশ কতক উপহিত এবং কতক প্রতিবিম্বিত হয়। এবং স্বচ্ছ বস্তুতে আলোক যেমন অধিক-মাত্রায় প্রতিবিম্বিত হয়, এবং অল্প মাত্রায় উপহিত হয়; সেই রূপ স্বচ্ছ অন্তঃকরণে পরমাত্মার প্রকাশ অধিক মাত্রায় প্রতিবিম্বিত হয় এবং অল্প মাত্রায় উপহিত হয়। শুদ্ধ-সত্ত্ব-রূপী অর্থাৎ অবাধ-প্রকাশ-রূপী যে ঐশী-শক্তি বা মায়া, তাহাই যাঁহার উপাধি-স্বরূপ, বেদান্তের মতে তিনিই ঈশ্বর এবং মলিন সত্ত্বরূপী অর্থাৎ বাধা-সমন্বিত-প্রকাশ-রূপী যে, অবিদ্যা, তাহাই যাঁহার উপাধি-স্বরূপ, তিনিই জীবাত্মা।

পরমাত্মার কিছুই অভাব নাই, তিনি পরিপূর্ণ আনন্দ স্বরূপ; অতএব তিনি যে আপনার কোন উপকার সাধনার্থে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন ইহা নহে। তিনি যদি আপনার কোন স্বার্থ সাধনের জন্য জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, তবে কি উদ্দেশে তিনি জগৎ সৃষ্টি করিলেন? জীবাত্মার মঙ্গল সাধনার্থে, জীবাত্মার অভাব পূরণার্থে, তাহাতে আর সংশয় নাই। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল এক মাত্র অদ্বিতীয় পরমাত্মা ছিলেন, আর কিছুই ছিল না, সুতরাং জীবাত্মা ছিল না। জীবাত্মা যখন ছিল না তখন জীবাত্মার অভাব পূরণার্থে সৃষ্টি করা, শিরোনাস্তি শিরঃ-পীড়ার ন্যায় অমূলক বোধ হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহা দেখা উচিত যে জীবাত্মা

যদিও বর্ত্তমান রূপে ছিল না কিন্তু ভবিষ্যৎ রূপে ছিল; অর্থাৎ "আছে" এরূপে ছিল না, কিন্তু "হইতে পারে এমন কিছু" এরূপে ছিল; গোলাকার চতুষ্কোণের ন্যায় জীবাত্মা যদি "কল্পনাতেও হইতে পারে না" এমন হইত,—তবেই জীবাত্মার অভাব পূরণোদ্দেশে সৃষ্টি করা অর্থ-হীন হইত। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবাত্মা "এখনো হয় নাই বটে কিন্তু ভবিষ্যতে হইতে পারে" এই ভাবে ঐশী শক্তির অন্তর্ভূত ছিল। "এখনো হয় নাই" তৎকালে এই যে তাহার অভাব, এই অভাব পূরণোদ্দেশে পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টি করিলেন। পরমাত্মা যদি জীবাত্মার সকল অভাব এক মুহূর্ত্তেই পূরণ করেন, তবে জীবাত্মা পূর্ণ আত্মা হয়, সুতরাং পরমাত্মা-জীবাত্মাতে কোন অংশেই প্রভেদ থাকে না, সুতরাং জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যে অভাব তাহা যেমন তেমনি থাকে। আপনার কোন প্রয়োজন সাধনার্থে নহে পরন্তু জীবাত্মার অভাব পূরণার্থে পরমাত্মা জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা পরমাত্মার মঙ্গল স্বরূপের পরিচয় দিতেছে। "ইচ্ছা হউক বা না হউক অগত্যা জগৎ সৃষ্টি করিতে হইবে" এভাবে ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন নাই, কোন প্রকারে বাধ্য হইয়া বা চালিত হইয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; চাই তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন, চাই না করেন, ইহা সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার ইচ্ছাধীন। "জীবাত্মা হউক্" এ প্রকার ইচ্ছা তিনি না করিলেও করিতে পারিতেন; তবে যে তিনি করিলেন, ইহাতে তাঁহার পরিপূর্ণ মঙ্গল-ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পরমাত্মা এক দিকে জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়া তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অভাব পূরণ করিয়াছেন, আর এক দিকে তাহাকে অনন্ত স্ফূর্ত্তির যোগ্যতা প্রদান করিয়া পরিমিত-ভাব-জনিত তাহার যে অভাব তাহাও তিনি পূরণ করিয়াছেন। জীবাত্মাকে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এবং অনন্ত স্ফূর্ত্তির যোগ্যতা প্রদান করিয়া, পরমাত্মা, জীবাত্মার অভাব যত দূর পূর্ণ হইতে পারে তাহা করিয়াছেন। পরমাত্মা জীবাত্মাকে স্বতন্ত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন বলিয়া বস্তুতঃ যে পরমাত্মা হইতে জীবাত্মা স্বতন্ত্র, ইহা বেদান্তের অভিপ্রেত নহে। জীবাত্মার অভ্যন্তরে, যে জ্ঞান অদ্য অস্ফুট আছে, কল্য তাহা পরিস্ফুট হইবে, পরশ্ব তাহা আরো পরিস্ফুট হইবে; যাহা আছে তাহাই পরিস্ফুট হইবে, এই মাত্র; যাহা নাই তাহা যে হইবে ইহা কখনই নহে। যেমন বৃক্ষের গাত্রে শাখা-প্রশাখা জুড়িয়া দেওয়াতে নহে, পরন্তু ভিতর হইতে শাখা প্রশাখা অঙ্কুরিত হওয়াতেই, বৃক্ষ আয়ত এবং বিস্তৃত হয়, সেইরূপ, জীবাত্মার উপরে জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়াতে নহে, পরন্তু জীবাত্মার অন্তর হইতে জ্ঞান পরিস্ফুট হওয়াতেই, জীবাত্মার জ্ঞানোন্নতি হয়। জীবাত্মার জ্ঞান অদ্য এখনি যৎপরোনাস্তি পরিস্ফুট হউক বা না হউক, তাহা অনন্তের দিকে উত্তরোত্তর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে, তাহার এরূপ যোগ্যতা আছে। জীবাত্মার অভ্যন্তরে অনন্ত জ্ঞানের সম্বল আছে; তাহার মধ্যে অল্পই ব্যক্ত-ভাবে পরিণত হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট অনন্ত জ্ঞান অব্যক্ত রহিয়াছে। সেই যে অব্যক্ত অসীম জ্ঞান, তাহা কি জন্য অব্যক্ত? না তাহা যদি একেবারে ব্যক্ত হয়, তবে জীবাত্মাতে পরমাত্মাতে কিছু মাত্র প্রভেদ থাকে না, সুতরাং জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের যে অভাব তাহা পরিপূরিত হয় না। কি জন্য জীবের জ্ঞান ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত ভাবে পরিণত হয়? না ব্যক্ত-ভাব স্ফূর্ত্তি-ভাব মুক্ত-ভাব জ্ঞানের স্বভাব-সিদ্ধ ভাব। পরমাত্মা জীবাত্মাকে পরিমিত করাতেই জীবাত্মা সাংসারিক সুখ-দুঃখের আবর্ত্তে নিক্ষিপ্ত

হইয়াছে, সত্য বটে; কিন্তু ইহাতে করিয়াই যে জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষিত হইয়াছে ইহা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। জীবাত্মাকে পরিমিত করিয়াছেন বটে কিন্তু তাহার জ্ঞান ক্রমে ক্রমে পরিস্ফুট হইয়া অপরিমিতের দিকে আয়ত্ত হইতে পারে, এই যে তাহার স্বাধীনতা, ইহা তিনি অব্যাহত রাখিয়াছেন। অতএব জীবাত্মাকে পরিমিত করিবার জন্যই যে পরিমিত করিয়াছেন তাহা নহে, জীবাত্মার অস্তিত্ব সমর্থন করিবার জন্যই পরমাত্মা তাহাকে পরিমিত করিয়াছেন।

জীবাত্মাকে পরমাত্মা কেন যে পরিমিত করিলেন, পরমাত্মার সেই মঙ্গল অভিপ্রায়ের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেহ কেহ এইরূপ এক নিদারুণ ভ্রমে পতিত হন যে, পরমাত্মা মঙ্গল স্বরূপ কি না, ইহা তাঁহারদের সন্দেহ-স্থল। পরমাত্মা যে মঙ্গল-স্বরূপ, ইহার যদি প্রমাণ আবশ্যক হয়, তবে জীবাত্মা নিজে তাহার যেমন প্রমাণ এমন আর কোথায়? জীবাত্মা পরিমিত না হইলে জীবাত্মা হইতেই পারিত না; অতএব জীবাত্মার পক্ষে "হওয়া" যদি মঙ্গল হয়, তবে সে মঙ্গলের জন্য পরমাত্মাকে ধন্যবাদ দিতে কেন আমরা কুণ্ঠিত হইব? এবং পরিমিত-ভাব যদি অমঙ্গল হয় ও অপরিমিত-ভাব যদি মঙ্গল হয়, তবে জীবাত্মার অপরিমিত স্ফূর্ত্তিকে যিনি কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন নাই, প্রত্যুত তাহার সমক্ষে অনন্ত কালের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া রাখিয়াছেন, এই রূপে অপরিমিত-ভাবের আকর্ষণ দ্বারা পরিমিত-ভাবের দোষ যত দুর খণ্ডন করিতে হয় তাহা করিয়াছেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে কেন আমরা ভার বোধ করিব?

যে আত্মা পরমাত্মার শক্তি কর্ত্তৃক নিয়মিত তিনিই জীবাত্মা, এবং জীবাত্মা যাঁহার শক্তি দ্বারা নিয়মিত, তিনিই পরমাত্মা। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে জীবাত্মা যখন পরমাত্মার শক্তি দ্বারা নিয়মিত; তখন পরমাত্মা জীবাত্মার বাহিরেই বর্ত্তমান, জীবাত্মার অন্তরে তিনি বর্ত্তমান নহেন। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, জীবাত্মার অন্তরের ভাব সম্যক্ রূপে অবগত না হইলে তাহাকে নিয়মিত করা যায় না, অন্তর হইতে নিয়মিত না করিলে তাহাকে বাহির হইতে নিয়মিত করা যায় না, তখন ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে যে, পরমাত্মা কেবল জীবাত্মার বাহিরে আছেন, কিন্তু অন্তরে নাই। কোন একটি সত্য-বিশেষে আমি যদি অন্তর হইতে বিশ্বাস না করি, তবে কি আমাকে তাহা বাহির হইতে বিশ্বাস করান যায়? "আমি দেহস্থিত" ইহা যদি আমি অন্তর হইতে বিশ্বাস না করি, তবে কি, বাহির হইতে, কেহ তাহা আমাকে বিশ্বাস করাইতে পারে? আমার শরীরে আঘাত করিলে আমার অন্তরে ব্যথা লাগে, এবং আমার শরীর স্বচ্ছন্দ থাকিলে আমার অন্তরে সুখোদয় হয়, এইরূপ আন্তরিক সুখ-দুঃখের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া দেও, এবং বাহিরে শরীর যেমন ভাবে চলিতেছে, তেমনি ভাবে চলুক, এরূপ অবস্থায় "আমি শরীরস্থিত" এ বিশ্বাস কখনই অন্তঃকরণে স্থান পাইবে না। এক দিকে যেমন, বাহির হইতে, শরীর আমাকে বেষ্টন করিয়া আছে, আর এক দিকে যদি সেইরূপ, অন্তর হইতে, "আমি শরীরস্থিত" এই বিশ্বাসটি স্ফুরিত না হইত, তাহা হইলে আমি শারীরিক নিয়মে নিয়মিত হইতাম না। অতএব পরমাত্মা, অন্তর-বাহির উভয় দিক্ হইতে আমাদিগকে নিয়মিত না করিলে আমরা প্রাকৃতিক নিয়মে নিয়মিত হইতাম না।

প্রথমতঃ জীবাত্মা, দ্বিতীয়তঃ জীবাত্মার বহিঃস্থিত অসীম দেশকাল-ব্যাপী নিয়ামক-

শক্তি-রূপিণী প্রকৃতি, তৃতীয়তঃ জীবাত্মা এবং প্রকৃতি উভয়ের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা; এ তিনের মধ্যে ভেদই বা কি রূপ এবং অভেদই বা কি রূপ, দেখা যাউক। প্রকৃতি পরমাত্মার শক্তি-স্বরূপ, সুতরাং অগ্নিতে এবং দাহিকা-শক্তিতে যেমন প্রভেদ নাই বলিলেও বলা যায় এবং আছে বলিলেও বলা যায়, সেইরূপ পরমাত্মাতে এবং প্রকৃতিতে এক ভাবে প্রভেদ আছে আর এক ভাবে প্রভেদ নাই। অগ্নিতে এবং দাহিকা-শক্তিতে প্রভেদ কি রূপ? না দাহিকা-শক্তি প্রকাশ-শক্তি ইত্যাদি নানা প্রকার শক্তির আধার-স্বরূপ যে এক পদার্থ, তাহাই অগ্নি; কিন্তু দাহিকা-শক্তি সেরূপ আপনার এবং প্রকাশ-শক্তির আধার-স্বরূপ নহে; অগ্নিতে এবং দাহিকা-শক্তিতে এইরূপ প্রভেদ। কিন্তু দাহিকা-শক্তি এবং অগ্নি, দুয়ের মধ্যে যখন লেশ মাত্রও ব্যবধান নাই; অর্থাৎ অগ্নি আছে ত দাহিকা শক্তি আছে, অগ্নি নাই ত দাহিকা-শক্তি নাই, এইরূপ যখন অগ্নি এবং দাহিকা-শক্তির মধ্যে তৃতীয় বস্তুর ব্যবধান নাই; তখন অগ্নি এবং দাহিকা-শক্তির মধ্যে ভেদ নাই এরূপ বলাও অসঙ্গত নহে। পরমাত্মার জগৎ সৃষ্টি করিবার যে শক্তি তাহাই প্রকৃতি; প্রকৃতির মধ্যে এবং পরমাত্মার মধ্যে তৃতীয় কোন কিছুর ব্যবধান নাই, এই ভাবেই প্রকৃতি এবং পরমাত্মার মধ্যে ভেদ নাই বলিতে পারা যায়। কিন্তু যখন দেখা যায় যে সৃষ্টি করিবার শক্তি এবং সৃষ্টি না করিবার শক্তি, পরমাত্মা উভয় শক্তিরই আধার-স্বরূপ; এবং প্রকৃতিকে যদি সৃষ্টি শক্তির আধার-স্বরূপেও ভাবা যায় তথাপি প্রকৃতিতে কেবল সৃষ্টি করিবারই শক্তি আছে, সৃষ্টি না করিবার শক্তি নাই, ইহার অধিক আর কিছুই যখন ভাবা যাইতে পারে না, তখন, অবশ্য, সৃষ্টি করিবার কর্ত্রী এবং সৃষ্টি করিবার-নাকরিবার কর্ত্তা উভয়ের মধ্যে প্রভেদ না ভাবিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারা যায় না। অর্থাৎ প্রকৃতিকে যদিও ঈশ্বরের ন্যায় সৃষ্টি করিবার কর্ত্রী মনে করিলে করা যাইতে পারে কিন্তু ঈশ্বরের ন্যায় তাহাকে সৃষ্টি না করিবার কর্ত্রী মনে করা যাইতে পারে না। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টি করিবার শক্তি এবং সৃষ্টি না করিবার শক্তি, এই যে দুই শক্তি, উভয়ই পরমাত্মাতে বর্ত্তমান আছে; তাহার মধ্যে সৃষ্টি করিবার শক্তি অপর-শক্তি হইতে সুতরাং সেই অপর শক্তির আধার-স্বরূপ এবং স্বীয় আধার-স্বরূপ পরমাত্মা হইতে ভিন্ন, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এই শেষোক্ত ভাবেই প্রকৃতি পরমাত্মা হইতে ভিন্ন। এক্ষণে, বেদান্তের মতে, জীবাত্মাতে পরমাত্মাতে ভেদাভেদ কি রূপ তাহার প্রতি প্রণিধান করা যাইতেছে।

প্রকৃতি শক্তি-রূপী, আত্মা বস্তু-রূপী। "আমি আছি" এই যে বস্তুর ভাব, ইহা আত্মাতেই আছে। যে কোন বস্তু হউক্ না কেন, তাহা যদি আপনার নিকট কখনো প্রকাশ পায়, তবে আত্মা-রূপেই প্রকাশ পায়, আর কোন রূপেই প্রকাশ পাইতে পারে না। কোন বস্তু যতক্ষণ না আপনার নিকট প্রকাশ পাইতেছে, ততক্ষণ তাহা হইবার-শক্তি-মাত্র ভাবে আছে, শক্তি রূপেই আছে। মনে কর যে প্রথমে আমি হইবার শক্তি-রূপে, অব্যক্ত রূপে, আছি; পরে সেই শক্তির যথোচিত পরিস্ফুটন হওয়াতে "আমি আছি" এই ভাবে আমি আপনার নিকটে ব্যক্ত হইলাম। যখন ব্যক্ত হইলাম, তখনই জানিলাম যে, পূর্ব্বে, যে আমি অব্যক্ত ছিলাম, এখন সেই আমি ব্যক্ত হইলাম। অতএব, ব্যক্ত এই যে

আমি, ইহা ইতি পূর্ব্বে ছিল না এমন নহে,—ছিল, কিন্তু অব্যক্ত ভাবে ছিল। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, বস্তু, কাল-ভেদে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত হয় বটে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহা যে কোন কালে অবর্ত্তমান হয়, তাহা নহে। যেমন কাল-ভেদে, তেমনি দেশ ভেদেও বস্তু, অবর্ত্তমান না হইয়া কেবল ব্যক্ত এবং অব্যক্ত হইয়া থাকে। প্রাচীর আপনার কাছে অব্যক্ত, আমার কাছে ব্যক্ত; এইরূপ, এক স্থানে অব্যক্ত, আর এক স্থানে ব্যক্ত। প্রাচীর তাহার নিজের ভাষায় (শব্দ-স্পর্শাদি-রূপ নৈসর্গিক ভাষায়) আমারদিগকে বলে যে "আমি আছি" এবং তাহাতেই আমরা সায় দিই, অর্থাৎ তাহা শুনিয়া "প্রাচীর আছে" এইরূপ বলি। এই রূপ দেখা যাইতেছে যে, প্রাচীর আমার নিকটে স্বচ্ছন্দে আপনাকে ব্যক্ত করে, অথচ তাহার নিজের নিকটে আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারে না। নিজের নিকটে যদি আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারিত, তবে "আমি আছি" এই ভাব ধারণ করিত। "আমি আছি" এ ভাব প্রাচীরে ব্যক্ত ভাবে নাই বলিয়া তাহা যে মূলেই নাই ইহা বলা ন্যায়-সঙ্গত নহে। কেন না, সুপ্তি কাল, জাগ্রৎ কাল ইত্যাদি কাল-ভেদে যেমন আমি ব্যক্ত এবং অব্যক্ত হই, অথচ অব্যক্ত ভাবের সময়েও আমি আছি, ব্যক্ত ভাবের সময়েও আমি আছি,—কোন কালেই "আমি আছি" ইহার ব্যত্যয় হয় না; সুষুপ্তি কালেও "আমি আছি" ইহার ব্যত্যয় হয় না; সেইরূপ, প্রাচীর আমার কাছে ব্যক্ত-ভাবে আছে এবং উহার নিজের কাছে অব্যক্ত-ভাবে আছে,—এই রূপ স্থান-ভেদে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত আছে বলিয়া, "অব্যক্ত ভাবের সময়ে উহা নাই—উহার নিজের কাছে উহা নাই, পরন্তু ব্যক্ত ভাবের সময়েই উহা আছে—আমার কাছেই উহা আছে," এরূপ বলা যুক্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। আমি আপনার কাছে আছি, কারণ আমি জ্ঞান পদার্থ। কিন্তু প্রাচীর ত জ্ঞান পদার্থ নহে, তবে "উহা আপনার কাছে আছে" ইহা বলিবার তাৎপর্য্য কি? ইহার তাৎপর্য্য এই যে "আমি আছি" এ ভাব, জ্ঞানের ভাব, প্রাচীরে এত অল্প পরিমাণে আছে যে, তাহা আমাদের জ্ঞানের সহিত সংযোগ-ব্যতিরেকে, স্বতঃ প্রকাশ পাইতে পারে না। অতীব ক্ষুদ্র পরমাণু যেমন অপর পরমাণু-সমষ্টির সহিত যোগ ব্যতিরেকে, প্রকাশ-ভাজন হয় না, উহাও সেই রূপ। নিম্নে ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে।
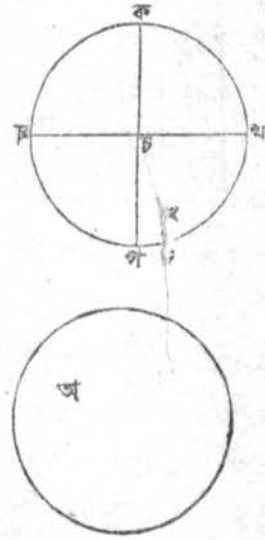
কখগঘ-চক্রের কেন্দ্রটি অর্থাৎ মধ্য বিন্দুটি চ-স্থানে ব্যক্ত হইয়াছে; অ-চক্রের কেন্দ্রটি অব্যক্ত রহিয়াছে; ইহা বলিয়া কি অ-চক্রের কেন্দ্রটি নাই? অ-চক্রের কেন্দ্রটিকে ব্যক্ত করিতে হইলে কি করিতে হয়? দুইটি মধ্য রেখা বা ব্যাসের সহিত তাহার যোগ সংস্থাপন করিয়া দিলেই তাহা ব্যক্ত হইয়া উঠে; যথা কগ এবং খঘ রেখা-দ্বয়ের সংযোগ-বশতঃ কখগঘ-চক্রের মধ্য-বিন্দু (চ) প্রকাশ পাইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিন্দুটি পূর্ব্বে ব্যক্ত ছিল না বলিয়া তাহা যে ছিল না, এবং এখন ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়াই যে আছে, ইহা নহে; বিন্দুটি যেমন এখন আছে, তেমনি পূর্ব্বে ছিল, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইত্যনুরূপ ইহা দেখা উচিত যে, প্রাচীরের নিজ সত্তা,

আমাদের ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ-বশতঃ ব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে,ইহা সত্য; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহা যে অব্যক্ত-ভাবে ছিল,ইহাতে আর সংশয় নাই। কেন্দ্রটির সহিত যৎকালে রেখা-দ্বয়ের সংযোগ হয় নাই, তৎকালে উহা কেন অব্যক্ত ছিল? না বিন্দুটি যখন রেখা-হইতে বিযুক্ত ছিল, তখন এইরূপ বোধ হইয়াছিল যে, মূলেই তাহার আয়তন নাই, কিন্তু যখন রেখার সহিত যুক্ত হইল, তখন জানিতে পারা গেল যে বিন্দু রেখারই প্রান্তভাগ—রেখারই অংশ—অতীব ক্ষুদ্রাংশ, অসীম ক্ষুদ্রাংশ, কিন্তু অংশ বটে। কেন না একটি রেখাকে যদি অর্দ্ধ খণ্ড করা যায়, সেই অর্দ্ধ খণ্ডকে আবার অর্দ্ধ খণ্ড, তৃতীয় অর্দ্ধ খণ্ডকে আবার অর্দ্ধ খণ্ড, চতুর্থ অর্দ্ধ খণ্ডকে আবার অর্দ্ধ খণ্ড, এইরূপ করিয়া যদি রেখাটিকে অসীম-ভাগে বিভক্ত করা যায়,* তবে সেই রেখাটি অসীম-ক্ষুদ্রায়তন-রেখা-রূপে পরিণত হয়, বিন্দু-রূপে পরিণত হয়। অতএব যেমন রেখা, তেমনিই বিন্দু; কিন্তু বিন্দুর আয়তন এমনি ঐকান্তিক রূপে অল্পতার দিক্ আশ্রয় করিয়া রহে যে, তাহা স্বতঃ ব্যক্ত হইতে পারে না,—রেখা-বিশেষের অংশ-রূপেই ব্যক্ত হইতে পারে; সুতরাং তাহাকে ব্যক্ত করিতে হইলে রেখা-দ্বয়ের সহিত তাহাকে সংযুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়।

প্রাচীরের নিজ-সত্তার পরিমাণ এত অল্প যে, ইন্দ্রিয়-দ্বারা আমারদের মনের সহিত তাহার সংযোগ না হইলে তাহা স্বতঃ প্রকাশ পায় না, কিন্তু, সংযোগ হইলে, আমারদের নিজ-সত্তার অন্তর্ভূত-রূপে তাহার নিজ-সত্তা ব্যক্ত হইয়া উঠে। কেন্দ্র যেমন চক্রের অন্তর্ভূত অসীম ক্ষুদ্র-চক্র রূপে ব্যক্ত হয়; বিন্দু যেমন রেখার অন্তর্ভূত অসীম ক্ষুদ্র-রেখা-রূপে ব্যক্ত হয়; উহাও সেইরূপ। এক কথায় এই যে, জ্ঞানের যোগে, অজ্ঞান, অসীম-অল্প-জ্ঞান-রূপে প্রতিভাত হয়; শূন্য রূপে নহে। বিন্দু যেমন অসীম আকাশের অন্তর্ভূত, অজ্ঞান সেইরূপ অসীম জ্ঞানের অন্তর্ভূত। কেন্দ্র যেমন চক্রের অন্তর্ভূত, এবং চক্র ও কেন্দ্র উভয়ই যেমন অসীম আকাশের অন্তর্ভূত, সেইরূপ জীবাত্মার ইন্দ্রিয়-গোচর বিষয়ের নিজ-সত্তা জীবাত্মার নিজ-সত্তার অন্তর্ভূত এবং জীবাত্মা ও তদীয় বিষয় উভয়ের নিজ-সত্তা পরমাত্মার নিজ-সত্তার অন্তর্ভূত। আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, শূন্য আকাশের সহিত পূর্ণ বস্তুর তুলনা করা, শ্বেতবর্ণের সহিত কৃষ্ণবর্ণের তুলনা করা। কিন্তু আকাশ নিজে বস্তু নহে বলিয়া তাহা যে বস্তুর সহিত কোন অংশেই উপমেয় নহে, ইহার কোন অর্থ নাই। "মুখ-চন্দ্র" বলিলে যেমন মুখকে চন্দ্র বলা হয় না, সেইরূপ শূন্য আকাশের সহিত বস্তুর উপমা দিলে বস্তুকে শূন্য বলা হয় না। "যাহা আছে তাহা আছে" এই যে একটি অপরিবর্ত্তনীয় ভাব ইহা বস্তুরও যেমন, আকাশেরও তেমনি, লক্ষণ; এবং "যাহা ছিল না, তাহা হইল" অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত হইবার এই যে ভাব, ইহা শক্তিরও যেমন, কালেরও তেমনি, লক্ষণ; সুতরাং বস্তু এবং শক্তির সহিত আকাশ এবং কালের উপমা দেওয়া অবৈধ নহে। অসীম আকাশ অকল্পিত; অর্থাৎ তাহা কল্পনা দ্বারা রচিত নহে, রচিত হইতে পারেও না। কিন্তু বিষয়-কল্পনা ব্যতিরেকে, কোন বিষয়াবচ্ছিন্ন আকাশকে অবশিষ্ট অসীম আকাশ হইতে পৃথক্

* আয়তন-বিশেষকে অসীম-ভাগে বিভক্ত করা আমাদের হস্তের অসাধ্য বলিয়া তাহা আমারদের জ্ঞানের অসাধ্য নহে; যদি তাহা জ্ঞানের অসাধ্য হইত, তবে ওরূপ অসীম-বিভাগের কথাই উত্থাপন-সাধ্য হইত না।

করা, বিষয়-কল্পনা ব্যতিরেকে আকাশকে পরিমিত করা, কোন প্রকারেই সম্ভবে না। এক কথায় এই যে, পরিমিত আকাশকে পরিমিত করা হইয়াছে বলিয়াই তাহা পরিমিত; কিন্তু অপরিমিত আকাশকে অপরিমিত করা হইয়াছে বলিয়া নহে, প্রত্যুত তাহা স্বতই অপরিমিত। পরিমিত আকাশ কল্পিত বস্তুর সহিত উপমেয়; অপরিমিত আকাশ অকল্পিত বস্তুর সহিত, আত্মার সহিত, উপমেয়। পরিমিত-কাল কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল-রূপিণী বৈষয়িক শক্তির সহিত উপমেয়; অনাদ্যন্ত-কাল স্বাধীন ইচ্ছা-রূপিণী আধ্যাত্মিক শক্তির সহিত উপমেয়।

জীবাত্মা আপনাকে যতক্ষণ প্রকৃতির সহিত জড়িত-রূপে দেখে, আত্মাতে-অনাত্মাতে-জড়িত-রূপে দেখে, ততক্ষণ বিশুদ্ধ-আত্মার যে লক্ষণ তাহা আপনাতে দেখিতে পায় না। বিশুদ্ধ আত্মার ভাব এই যে "আমি আছি" "আমি যে, কোন কালে থাকিব না, এ ভাবনা আমার নাই" "আমি আছি—ইহাতেই আমি যৎপরোনাস্তি আনন্দিত আছি"। কিন্তু জীবাত্মার ভাব এই যে, "আমি এইরূপ-আছি বা ঐরূপ-আছি" "আমি এইরূপ আছি বলিয়াই আনন্দিত আছি, আমি যদি ওরূপ হই তবে আমার ক্ষতি হয়"! অর্থাৎ "আমি আছি" এই যে একটি ভাব, এই ব্যাপক ভাবটিকে জীবাত্মা "এইরূপ" "ঐরূপ" ইত্যাদি-ক্রমে পরিমিত করিয়া ভোগ করিতে চায়। কেন এরূপ চায়? না তদ্ব্যতিরেকে, ঈশ্বর-দত্ত জীবাত্মার যে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব, তাহা রক্ষিত হইতে পারে না। আমার শরীর মন যদি সুস্থ এবং স্বচ্ছন্দ থাকে, তবেই "আমি আছি" ইহা আমার নিকট প্রকাশ পায়; এবং যে পরিমাণে আমার শরীর পীড়িত ও মন চঞ্চল থাকে, সেই পরিমাণে "আমি আছি" ইহা প্রকাশ পায় না। এইরূপ, প্রকাশ অপ্রকাশ এবং উভয়াত্মক যে সত্ত্ব তম এবং রজোগুণ, তাহারদিগেরই অধিকারের মধ্যে জীবাত্মা বাস করিতেছে, প্রকৃতির রাজ্যে বাস করিতেছে, সুতরাং প্রকৃতির নিয়ম (শারীরিক মানসিক নিয়ম) পালন করিলে তবেই "আমি আছি" ইহার যে আনন্দ তাহা আমরা ভোগ করিতে পারি। "আমি আছি" ইহা যে পরিমাণে প্রকাশ পায়*, সেই পরিমাণেই আমরা সুখী হই, যে পরিমাণে অপ্রকাশ হয়, সেই পরিমাণে বিষাদ-গ্রস্ত বা মোহ-গ্রস্ত হই, যে পরিমাণে প্রকাশ এবং অপ্রকাশ উভয়ের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়, সেই পরিমাণে আমরা দুঃখ ভোগ করি। সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণের সহিত সুখ দুঃখ এবং মোহের ঐরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

জীবাত্মা ত্রি-গুণের অধিকার-মধ্যে বাস করে; পরমাত্মা ত্রিগুণের অতীত। এস্থলে পাছে কেহ এইরূপ একটি গুরুতর সংশয়ে পতিত হন যে, পরমাত্মার যদি সত্ত্ব-গুণ বা প্রকাশ-গুণ না থাকে, তবে "তিনি স্বপ্রকাশ" এ কথা কিরূপে রক্ষা পাইতে পারে? এজন্য ইহা বলিয়া-দেওয়া আবশ্যক যে, যে-প্রকাশ বিরোধী-গুণ-দ্বয় কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহাই সত্ত্ব-গুণ শব্দে উক্ত হয়; শুদ্ধ

* "আমি আছি" ইহা যখন করতলন্যস্ত আমলকবৎ অতীব নিশ্চিত-রূপে প্রকাশ পায়, তখনই "আমি কোন কালেই অবর্ত্তমান হইব না" ইহা প্রকাশ পায়। শরীর-মন অতীব সুনিয়মে না থাকিলে, শরীর-মনের স্বাস্থ্যের কোন প্রকার ত্রুটি হইলে, ওরূপ হওয়া দুষ্কর। শরীর-মনের স্বাস্থ্য কেবল যে শরীরের উপর নির্ভর করে তাহা নহে, মনের উপরেও নির্ভর করে। যে অংশে উহা মনের উপর নির্ভর করে, সেই অংশে আমরা মনকে নিয়মিত করিয়া, স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারি। ক্রমাগত আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থের বিষয় চিন্তা না করিয়া যথা-সময়ে পরমাত্মাতে মনঃ সমাধান করিলে আমরা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইতে পারি।

বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপের যে, নিত্য-প্রকাশ, তাহা তাঁহার নিকটে কোন কালেই অপ্রকাশ বা বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে পারে না, সুতরাং তাহা সত্ত্ব-গুণ নহে। দীর্ঘ প্রস্থ বেধের ন্যায় সত্ত্ব রজ এবং তমোগুণ পরস্পরাপেক্ষী; অর্থাৎ যেমন দৈর্ঘ্য ও বেধ অপেক্ষা প্রস্থের পরিমাণ যথেচ্ছা অধিক হইতে পারে বলিয়া, অথবা দৈর্ঘ্যের পরিমাণ অপর দুয়ের অপেক্ষা যথেচ্ছা অধিক হইতে পারে বলিয়া, দৈর্ঘ্য এবং বেধ বিহীন প্রস্থ থাকিতে পারে না অথবা প্রস্থ এবং বেধ বিহীন দৈর্ঘ্য থাকিতে পারে না, সেই রূপ প্রকৃতির প্রকাশ অপ্রকাশ এবং উভয়াত্মক গুণ যদিও বস্তু বিশেষে পরিমাণ-বিশেষে অবস্থিতি করে বটে তথাপি তাহারা পরস্পর-নিরপেক্ষ ভাবে কুত্রাপি বর্ত্তিতে পারে না। কিন্তু পরমাত্মার যে নিত্য প্রকাশ তাহা সত্ত্ব-গুণ নহে, কেন না তাহা বাধা এবং চঞ্চলতা কর্ত্তৃক, রজস্তমো-গুণ কর্ত্তৃক, মূলেই আক্রান্ত হইতে পারে না।

ত্রিগুণাতীত পরমাত্মার মধ্যে এবং আমাদের বিশুদ্ধ জ্ঞানের মধ্যে ব্যবধান নাই— ইহা দেখিয়াই বেদান্ত জীবাত্মা-পরমাত্মার মধ্যে অভেদ ভাব নিশ্চয় করিয়াছেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের চক্ষে সমস্ত জগৎ এক জগৎ; জগৎ ঐশী শক্তি; ঐশী শক্তি পূর্ণ-মঙ্গল-ভাব; পূর্ণ মঙ্গল-ভাব, অতল-স্পর্শ গভীর জ্ঞান-সমুদ্র; ইনিই পরমাত্মা, ইঁহার মধ্যে যাহা কিছু থাকিবার বা হইবার, সকলি অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। কিন্তু এই মহান্ ভাবকে বুদ্ধি আপনার আয়ত্তের মধ্যে আনিতে গিয়া পরাভব মানে। ভেদ ভিন্ন বুদ্ধির কার্য্য চলে না। বুদ্ধির "আমি" কে? না যাহা "তুমি" "তিনি" "ইহা" "উহা" ইত্যাদি হইতে ভিন্ন। বিশুদ্ধ জ্ঞানের "আমি" কে? না যাহা "তুমি" "তিনি" ইত্যাদি সকলের সহিত অভিন্ন অর্থাৎ অব্যবহিত। আমি যখন বলি "ইহা আমার পুস্তক" তখন "ইহা তোমার পুস্তক নহে" এইরূপ বলা আমার অভিপ্রেত। কিন্তু যখন আমরা বলি যে, "যিনি জগতের ঈশ্বর তিনি আমার ঈশ্বর" তখন "তিনি তোমার ঈশ্বর নহেন" ইহা আমার অভিপ্রেত হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত ইহাই আমার তাৎপর্য্য যে যিনি সমুদায় জগতের অন্তরাত্মা, তিনি, তোমার, আমার, প্রত্যেকের অন্তরাত্মা। জীবের যিনি অন্তরাত্মা জগতের তিনি অন্তরাত্মা। সেই অন্তরাত্মাকে ছাড়িয়া দিলে, জীব এবং জগৎ উভয়ই প্রকৃতিতে বিলীন হয় বা প্রকৃতি হইয়া যায়। এক দিকে যেমন, প্রকৃতিতে পরমাত্মাতে ব্যবধান নাই সুতরাং ভেদ নাই বলা যাইতে পারে, আর এক দিকে তেমনি, সৃষ্টি-না-করিবার শক্তি হইতে সৃষ্টি-করিবার শক্তি ভিন্ন, এই ভাবে পরমাত্মা হইতে প্রকৃতি ভিন্ন, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। প্রকৃতির সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, জীবের সম্বন্ধেও তাহাই বলা যাইতে পারে; কেন না জীবের মধ্য হইতে অন্তরাত্মাকে পৃথক্ করিলে, জীব প্রকৃতি-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়।

পৌত্তলিকতা।

কেহ কেহ এই কথা বলেন যে জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকৃত নিরাকার স্বরূপ উপলব্ধি পূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অব্যবহিত রূপে তাঁহার উপাসনাকেই অপৌত্তলিক উপাসনা বলা যাইতে পারে। আর চর্ম্ম-চক্ষু কিম্বা মনশ্চক্ষুর সম্মুখে স্রষ্টার প্রতিনিধি স্বরূপ সৃষ্ট বস্তু স্থাপন করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার উপাসনাকে পৌত্তলিক উপাসনা কহে। কিন্তু পৌত্তলিক উপাসনা হইতে অপৌত্তলিক উপাসনাকে এরূপ করিয়া প্রভেদ করা যাইতে পারে না, কারণ স্বরূপের উপাসনাকে যদি অপৌত্তলিক উপাসনা বলা যায়, তাহা

হইলে উক্ত দুই প্রকার উপাসনার মধ্যে কোনটিকেই অপৌত্তলিক উপাসনা বলা যাইতে পারে না, কারণ উভয় প্রকার উপাসনাতে ঈশ্বরের প্রতি রূপের উপাসনা পরিলক্ষিত হয়। এমন কি প্রতিরূপের উপাসনা সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্মকে একেবারে বিলোপ করা হয়। সকল উপাসনাই ঈশ্বরের প্রতিরূপের উপাসনা। কোন উপাসনাই ঈশ্বরের স্বরূপের উপাসনা নহে। "স্বরূপতঃ তাঁরে কে জানিতে পারে যিনি রহিত উপমা"। যখন আমরা কোন মতে তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে পারি না, তখন স্বরূপতঃ তাঁহাকে কি প্রকারে উপাসনা করিতে পারি? এই দৃষ্টিতে কেবল মনুষ্য নহে, উন্নত জ্ঞান সম্পন্ন দেবতারাও পৌত্তলিক। ঈশ্বর অনন্ত স্বরূপ, আমাদিগের মন সম্পূর্ণ রূপে তাঁহাকে ধারণ করিতে সক্ষম হয় না। তাঁহাকে আমরা যত উচ্চ করিয়া ভাবি না কেন, তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ আমাদিগের চিন্তার অতীত স্থানে স্থিতি করে। সেই অব্যক্ত জ্যোতিঃ সমুদ্রের মধ্যে গভীর প্রদেশ অপেক্ষা গভীরতর প্রদেশ আছে। যে বৃষ্টিবিন্দুতে অনন্ত দ্যুলোক প্রতিবিম্বিত হয়, সেই বৃষ্টিবিন্দু দ্যুলোকের তুলনায় যদ্রূপ ক্ষুদ্র, সেইরূপ তাঁহার স্বরূপের যে অংশ আমরা দেখিতে পাই তাহার সহিত যে অংশ আমরা দেখিতে পাই না তাহার তুলনা করিলে তাহা সেইরূপ ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। আমাদিগের ঈশ্বর-জ্ঞান ঈশ্বরের স্বরূপের সঙ্গে কখনই সম্পূর্ণ রূপে ঐক্য হইতে পারে না। তাহাতে অবশ্য ত্রুটি, অসামঞ্জস্য, অথবা বিক্ষেপ থাকিবেই থাকিবে। আমাদিগের বর্ত্তমান ঈশ্বর-জ্ঞান অপেক্ষা যে পর্য্যন্ত না মহত্তর জ্ঞান আমাদিগের মনে উদিত হয়, সে পর্য্যন্ত আমাদিগের বর্ত্তমান ঈশ্বর-জ্ঞান ঈশ্বরস্বরূপের প্রতিনিধি মাত্র হইয়া আমাদের আত্মাতে অবস্থিতি করে। অতএব মানবীয় জ্ঞানানুসারে ঈশ্বর উপাসনা কেবল তাঁহার প্রতিরূপের উপাসনা বলিতে হইবে। যে পৌত্তলিক প্রস্তরখণ্ডের উপাসনা করেন এবং যে উজ্জ্বল জ্ঞানালোকসম্পন্ন ব্রাহ্ম দ্বিপ্রহর রজনীতে নক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশের নিম্নে দণ্ডায়মান হইয়া বিশ্ব-মন্দিরে প্রণত হয়েন, তাঁহারা উভয়েই সেই বাক্য মনের অগোচর অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরের প্রতি রূপের উপাসনা করেন। এক্ষণে বিবেচনা করিতে হইবে যে উপাসক আপনার মনোমন্দিরের প্রাচীরে ঈশ্বরের যে প্রতিরূপ চিত্রিত করেন, তাহা মনুষ্যের অপূর্ণস্বভাবযুক্ত পুত্তলিকা অথবা সত্য উচ্চ ও পবিত্র আভিজ্ঞানিক ভাব। এই বিবেচনার উপর ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিকের মধ্যে প্রভেদ নির্ভর করে।

কেহ কেহ আবার এই কথা বলেন যে দৃশ্যমান প্রতিমার উপাসনাকেই পৌত্তলিকতা কহে। আর অদৃশ্য প্রতিমার উপাসনাকে অপৌত্তলিক উপাসনা কহে। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এক অন্ধ পৌত্তলিককেও ব্রাহ্ম বলা যাইতে পারে। কেবল ইন্দ্রিয় গোচর পদার্থের অভাব হইলেই যে উপধর্ম্ম পরিত্যক্ত হইল এমন নহে। বাহ্য ও মানসিক দুই প্রকার পৌত্তলিকতাকেই পরিত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু প্রতিরূপ ও পুত্তলিকা দুই ভিন্ন পদার্থ। প্রতিরূপকে কখন পুত্তলিকা বলা যাইতে পারে না। যদি প্রতিরূপের উপাসনাকে পৌত্তলিকতা বলা যায়, তাহা হইলে সত্য ধর্ম্ম দাঁড়াইবার স্থান না পাইয়া নিবৃত্ত হয়; তাহা হইলে জ্ঞান স্বরূপ, প্রেম স্বরূপ, পবিত্র স্বরূপ, সর্ব্ব নিয়ন্তা পুরুষের উপাসনা না করিয়া অলক্ষ্য অগম্য ভাবের অতলস্পর্শ সমুদ্র দেখিয়া উপাসনা কার্য্য হইতে নিরস্ত হইতে হয়; তাহা হইলে জীবন্ত

পুরুষের উপাসনাকে পৌত্তলিকতা জ্ঞান করিয়া তাহা একবারে পরিত্যাগ করিতে হয়। প্রতিরূপের উপাসনা পরিত্যাগ করিলে ধর্ম্ম নির্জীব অদ্বৈতবাদ হইয়া পড়ে। অনন্ত সৃষ্টি কার্য্যের চিন্তা ঈশ্বর উপাসনাতে পরিণত হয় না যে পর্য্যন্ত না আমরা এমন বিশ্বাস করি যে সৃষ্টি ও অস্তিত্ব, এক চির বর্ত্তমান আত্মা—এক ধর্ম্মাবহ পুরুষের বর্ত্তমান ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, যিনি সম্পূর্ণ রূপে মঙ্গলময় ও সম্পূর্ণ রূপে অমঙ্গল বিমুখ, যিনি স্বাভাবিক জ্ঞান, বল, ক্রিয়াসম্পন্ন এবং যাঁহার উপরে এই জগতের নিয়ম, শৃঙ্খলা, সৌন্দর্য্য, নিম্নোচ্চ শ্রেণীর ব্যবস্থা, উন্নতি, এবং পরিণাম নির্ভর করে। যে পর্য্যন্ত না ঈশ্বরকে পুরুষ অর্থাৎ আত্মা বলিয়া উপাসনা করি, সে পর্য্যন্ত তাঁহার উপাসনাই হইতে পারে না; কিন্তু তিনি পূর্ণ-পুরুষ, সামান্য পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা নহে। পূর্ণ পুরুষের উপাসনা কখন পৌত্তলিকতা হইতে পারে না। অতএব পৌত্তলিকতার প্রকৃত লক্ষণ এই বলিয়া অবধারিত হইতেছে যে, পৌত্তলিক, ঈশ্বরের যে প্রতিরূপের উপাসনা করেন, তাহা মিথ্যা প্রতিরূপ, কিন্তু বিশুদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি যে প্রতিরূপের উপাসনা করেন, তাহা সত্য প্রতিরূপ। তাহা ঈশ্বরের প্রকৃত স্বরূপ হইতে ভাবে তত ন্যূন নহে যত পরিমাণে ন্যূন।

উপরে যাহা কথিত হইল তাহা হইতে আমরা দুই উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি। প্রথম উপদেশ এই যে নিজে আমাদিগের পৌত্তলিকতা বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এবং দ্বিতীয় উপদেশ এই যে পৌত্তলিকদিগকেই একেবারে ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট মনে না করি।

অসাধারণ উদ্ভিদ্।

জগদীশ্বর এই বিশাল বিশ্বরাজ্যের কত স্থানে যে কত প্রকার আশ্চর্য্য পদার্থ বিন্যাস করিয়া ইহার শোভা ও মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা তিনি ভিন্ন আর কেহই সম্যক্ অবগত নহেন। আমাদিগের মধ্যে যিনি তাঁহার কৃপায় কিঞ্চিৎ জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট এই বিশ্বের প্রত্যেক সামান্য স্থান ও ক্ষুদ্র পদার্থও এক একটি মহা-তীর্থ স্বরূপ। যত দিন জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি আমাদিগের সাংসারিক নিত্য ব্যাপার কয়েকটি অতিক্রম করিয়া তাহার পৃষ্ঠ দেশে গমন করিতে না পারে, তত দিন এই জগতের কিছুই আমাদিগের নিকট স্রষ্টার মহিমা ঘোষণা করিতে পারে না, কিছুই ক্রমান্বয়ে দশ দিবস কাল পর্য্যন্ত আমাদিগের নিকট নূতন বেশ, আশ্চর্য্য বেশ বা সুন্দর বেশ ধারণ করিয়া প্রকাশ পাইতে পারে না। অজ্ঞতার এমনই সম্মোহনী শক্তি যে তাহার প্রভাবে আমরা কোন বিষয় কিছুমাত্র না বুঝিয়াও বলি উত্তম রূপে বুঝিয়াছি এবং কিছুমাত্র না জানিয়াও বলি উত্তম রূপে জানিয়াছি। এইরূপে অজ্ঞানই আমাদিগের নিকট এই অত্যাশ্চর্য্য অনুপম বিশ্বের মূলগত প্রকৃত সৌন্দর্য্য সর্ব্বতোভাবে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে।

আমরা প্রথম হইতে যত দিন অজ্ঞানের অধিকারে বাস করিব, তত দিন আমরা তাহার প্রভাবে জগতের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল পদার্থ ও সকল বিষয় দর্শন ও শ্রবণ করিয়া স্রষ্টার অপার মহিমার কণামাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না, সুতরাং আত্মারও কিছু মাত্র উন্নতি হইবে না, ইহা তিনি পূর্ব্বে জানিতে পারিয়া উপযুক্ত রূপে তাহার প্রতিবিধান করিয়া রাখিয়াছেন। আমাদিগের

মধ্যে যিনি যতদূর অজ্ঞানান্ধ হউন না কেন তাঁহার জ্ঞান স্ফূর্ত্তি, আনন্দ বর্দ্ধন এবং ধর্ম্মোন্নতি নিমিত্ত মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই জগতের স্থানে স্থানে তদ্রূপ আশু বিস্ময়-কর পদার্থ সকলও বিন্যস্ত করিয়া রাখি-য়াছেন। যে সকল পদার্থের স্থূল তত্ত্ব পর্য্যন্ত এরূপ সুন্দর ও বিস্ময়-জনক যে তাহার দর্শন বা শ্রবণ মাত্রেই জগৎ ও তৎ-প্রসবিতার অসীম মাহাত্ম্যের মহদাভা হৃদয়ে প্রতিভাত না হইয়া থাকিতে পারে না, আমাদিগের ন্যায় অসংখ্য অজ্ঞানান্ধ জড় ব্যক্তির চক্ষুর্দানার্থে, মঙ্গল নিধান বিধাতা পুরুষ সেরূপ বিস্তর পদার্থ ও বিষয় স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্য আমরা একটি উদ্ভিদ বিশেষের সামান্য তত্ত্ব আলোচনা করিয়া এই বিষয়ের যাথার্থ্য প্রতিপাদন করিবার সংকল্প করিয়াছি।

ইউরোপীয় বিজ্ঞান শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা যে হাইগ্রোমিটার নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। বায়ুতে কি পরিমাণে জলীয়াংশ ভাসমান আছে, তা-হাই নির্দ্ধারণ করা উক্ত যন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য; এই হেতু যদি আমরা ঐ যন্ত্রকে আর্দ্রতা মান যন্ত্র বলি, তাহা হইলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। ডেনিয়েল, রেগ্নল্ট ও লেস্লি প্রভৃতি অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত অনেক প্রকার আর্দ্রতামান যন্ত্র প্রস্তুত করিয়া ব্যব-হার করিয়াছেন, কিন্তু কেহই বিশুদ্ধ ফল লাভ করিতে পারেন নাই। কোন ব্যক্তির যন্ত্রই অল্প মূল্যবান নহে কিন্তু কোনটিই ভ্রমপ্রমাদ শূন্য হয় নাই। মহান্ বিশ্বকর্ম্মার একটি সহজ আর্দ্রতামান যন্ত্র আছে, তা-হার কার্য্যকারিতা এরূপ চমৎকার যে তাহা সন্দর্শন করিলে কেহই অতিমাত্র পুলকিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। দক্ষিণ ভারতবর্ষের মহীসুর ও কর্ণাট প্রদেশে এবং এখানকার পর্ব্বতাদিতে এক প্রকার তৃণ জন্মে তাহার সাধারণ নাম পানিমূল বা অবেনাহুল। এদেশের অন্য কোন স্থানে যে উহা নিতান্ত দুর্লভ তাহাও নহে। যাহা হউক উহা সর্ব্বত্রই প্রায় জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়াদিতে জন্মে। ঐ তৃণে যে শস্য জন্মে যবাদির ন্যায় তাহা হইতে কতক গুলি করিয়া হুল বহির্গত হয়। ঐ সকল হুল অতি দৃঢ় এবং উহারা বাম হইতে দক্ষিণ দিগভিমুখে রজ্জুর ন্যায় পরস্পর জড়িত হইয়া থাকে। প্রত্যেক শস্য-সংলগ্ন হুল প্রায় এক বুরুল পর্য্যন্ত উত্থিত হইবার পর ক্রমে সংকীর্ণাগ্র হইয়া উঠে। ফলতঃ কোন তৃণের সমীপে দণ্ডা-য়মান হইয়া দৃষ্টিপাত করিলে তাহার সমুদায় হুলের সমষ্টি শিথিল রজ্জু খণ্ড বলিয়া প্রতী-য়মান হয়। উক্ত রজ্জু খণ্ডে ৫।৭ টি হুলের অধিক দৃষ্ট হয় না। যদি ছুরিকা দ্বারা উক্ত রজ্জু কর্ত্তন করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে তদভ্যন্তরে দুইটি প্রধান গুণ (সূত্র) প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ দুইটি গুণ একটি সূক্ষ্ম ঝিল্লি দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যেমন বীজ কোষে আসিয়া একটি অখণ্ড গুণে সেই রূপ অগ্রভাগে যাইয়া আবার একটি অখণ্ড অগ্রে পরিণত হইয়া থাকে। যখন আর্দ্র বায়ু দ্বারা উক্ত রজ্জু সংস্পৃষ্ট হয়, তখন উহা অধিকতর জড়িত অর্থাৎ বাম হইতে দক্ষিণ দিগভিমুখে আব-র্ত্তিত হইতে থাকে। আবার যদি উহার গাত্রে শুষ্ক বায়ু সংস্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে উহা জড়িতাবস্থা হইতে মুক্ত হইতে থাকে, অর্থাৎ দক্ষিণ হইতে বাম দিগভিমুখে আব-র্ত্তিত হইতে থাকে। যখন যে কারণে যে দিকে আবর্ত্তন হউক না কেন, তাহা প্রায় ৫।৭ বারের ন্যূন হয় না। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রত্যেক রজ্জু খণ্ডে ৫।৭ টি

করিয়া স্থূল থাকে, এক্ষণে উক্ত হইল যে উহার প্রত্যেক বারের আবর্ত্তন ৫।৭ বারের ন্যূন হয় না, সুতরাং সকলেই বুঝিতে পারেন যে চূড়ান্ত আবর্ত্তন গুলি স্থূল সংখ্যানুসারেই হইয়া থাকে।

এই নৈসর্গিক আর্দ্রতামান যন্ত্রের কার্য্যকারিতা এরূপ চমৎকার যে বায়ু সামান্য রূপে আর্দ্র হইলেও ইহা দ্বারা তাহা স্পষ্টাক্ষরে জানা যাইতে পারে।

সামান্য আর্দ্রতা বা শুষ্কতা স্থলে আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের যন্ত্রগুলি কিছুই কার্য্যকর হয় না,কিন্তু আমাদিগের নৈসর্গিক যন্ত্রের নিকট কিছুই এড়াইতে পারে না।

প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা প্রতীত হইয়াছে যে যদি উক্ত পানিমুল তৃণের স্থূল-রজ্জুর গাত্রে ফুৎকার প্রদান করা যায় বা তাহার গাত্রের এক বুরুল অন্তরে হস্তাঙ্গুলি স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তন্নির্গত বাষ্পের সামান্য আর্দ্রতা নিবন্ধনও উহা কথঞ্চিৎ পরিমাণে আবর্ত্তিত হইতে থাকে। যদি উহার গাত্রে জল বা উষ্ণ-জল-নিঃসৃত বাষ্প প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে উহা প্রবল বেগে ৫।৭ বার বাম হইতে দক্ষিণ দিগভিমুখে আবর্ত্তিত হয়। আবার যদি এক খণ্ড উত্তপ্ত লৌহ উহার সন্নিকটে ধরিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ঐ তাপ দ্বারা উহার জলীয়াংশ যেমন শুষ্ক হইয়া যাইতে থাকে,তেমনি উহা সবেগে ৫।৭ বার দক্ষিণ হইতে বাম দিগভিমুখে পুনরাবর্ত্তিত হয়। এরূপ চমৎকার গুণ-বিশিষ্ট নৈসর্গিক যন্ত্র দ্বারা যে বায়ুর আর্দ্রতা অতি সুন্দর রূপে জানা যাইতে পারে, তাহা এক্ষণে সকলেই সহজে অনুমান করিতে পারেন। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে ইহা দ্বারা তাপমান যন্ত্রেরও কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে শুদ্ধ শীতোষ্ণতা দ্বারা ইহার কিছুমাত্র বিকার জন্মে না।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের* অনেক ব্যক্তির মুখে এই তৃণের উক্ত রূপ আশ্চর্য্য কার্য্যকারিতার বিষয় অবগত হইয়া হেনরি কেটার নামক এক জন ইউরোপীয় সৈন্যাধ্যক্ষ কয়েক বৎসর হইল এতদ্দ্বারা একটি ব্যবহারোপযোগি যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন। আমাদিগের নৈসর্গিক যন্ত্র অপেক্ষা তাঁহার যন্ত্র কোন অংশে উৎকৃষ্টতর না হইয়া বরং অনেকাংশে নিকৃষ্টই হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার যন্ত্র দ্বারা এই সুবিধা হইয়াছে যে উক্ত নৈসর্গিক যন্ত্রের আবর্ত্তনের দ্রুততা নিবন্ধন ক্ষীণ দৃষ্টি মনুষ্য তাহা অনেক সময়ে লক্ষ্য করিতে পারেন না, কিন্তু তাঁহার যন্ত্রের কার্য্যকারিতা সকলেই ধীরে ধীরে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন। পাঠকবর্গের কৌতুহল নিবারণার্থে নিম্নে আমরা উক্ত সাহেবের মানিমুল তৃণ নির্ম্মিত যন্ত্রের প্রতিরূপ ও স্থূল বিবরণ প্রদান করিলাম।
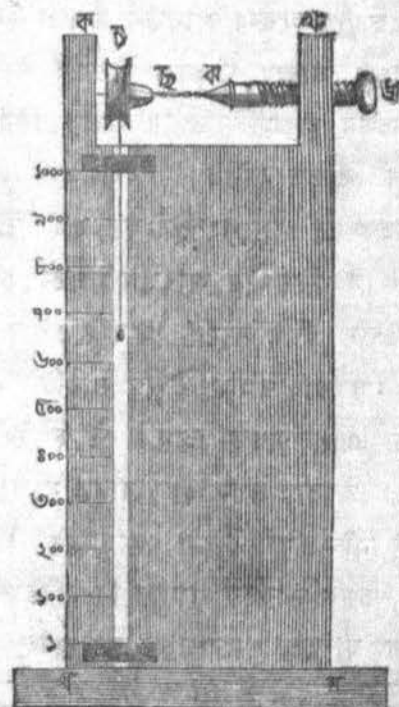
ক খ গ ঘ এক খণ্ড চতুষ্কোণ কাষ্ঠ। ক

* দক্ষিণ দেশীয়েরা যে এই তৃণকে পানি+মূল=

দিকের কাষ্ঠ শৃঙ্গের গাত্রে চ নামক একটি হস্তিদন্ত নির্ম্মিত চক্র আলের উপর স্থাপিত এবং ঘ দিকের শৃঙ্গের মধ্য দিয়া জঝ নামক একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত পেঁচ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ঐ পেঁচের অগ্রভাগ ক্রম সূক্ষ্ম ও লেখনীর ন্যায় দ্বিখণ্ডিত এবং ঐ দ্বিখণ্ডিত স্থানে একটি অঙ্গুরীয় সন্নিবিষ্ট আছে। ছঝ পানিমূল তৃণের হুল বিনির্ম্মিত রজ্জুর মধ্য খণ্ড। ঐ রজ্জুর এক প্রান্ত চ চক্রের ক্রমসূক্ষ্ম ভাগস্থিত ছিদ্রে এক খণ্ড কাষ্ঠিকা দ্বারা এবং অপর প্রান্ত জঝ পেঁচের ক্রমসূক্ষ্ম দ্বিখণ্ডিত ভাগের মধ্যে অঙ্গুরীয় দ্বারা আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। অপরন্তু, চ চক্রের নিম্ন দেশে দুইটি দীর্ঘাকার কাচ নির্ম্মিত নল লম্বভাবে পার্শ্বে পার্শ্বে স্থাপিত হইয়া রহিয়াছে এবং উক্ত চক্র-সম্বন্ধ দুই গাছি সূত্র দুইটি তুল্য পরিমাণ ক্ষুদ্র ভার সংলগ্ন হইয়া ঐ নল দ্বয়ের অভ্যন্তরে ঋজু ভাবে পতিত রহিয়াছে। ঐ দুইটি সূত্র এরূপ ভাবে চক্রের সহিত সম্বদ্ধ ও জড়িত হইয়া রহিয়াছে যে চক্রের আবর্ত্তন বশতঃ একটি ভার যখন নলের ঊর্দ্ধতম প্রদেশে উত্থিত হইবে তখন অপরটি তদীয় নলের নিম্নতম প্রদেশে পতিত হইবে। যখন ছঝ হুল-রজ্জুতে আর্দ্র বায়ু সংস্পৃষ্ট হয়, তখন উহার দক্ষিণ দিগভিমুখীন আবর্ত্তন বশতঃ চক্রটিও উক্ত দিগভিমুখে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, সুতরাং তখন ঊর্দ্ধস্থ ভারটি নিম্নে পতিত এবং অধস্থ ভারটি ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে। আবার যখন শুষ্ক বায়ুর সংস্পর্শে রজ্জুটি বাম দিগভিমুখে আবর্ত্তিত হইতে থাকে, তখন ভারদ্বয় আবার বিপরীত দিগভিমুখে যাইতে থাকে। হুল রজ্জু দীর্ঘ হইলে তাহার আবর্ত্তন সংখ্যা অধিক এবং হ্রস্ব হইলে তাহার অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। চক্রের অধিক আবর্ত্তন বশতঃ ভারদ্বয় কাচ নলদ্বয়ের সীমা অতিক্রম করিয়া যাইতে না পারে, এই জন্য জঝ পেঁচ সংস্থাপিত রহিয়াছে। যদি ভারদ্বয় কাচ নলের সীমা অতিক্রমকরিয়া যাইতে থাকে,তাহা হইলে পেঁচটি অধিকতর প্রবিষ্ট করিয়া তাহার দ্বিখণ্ডিত অগ্রভাগে রজ্জু প্রান্ত বদ্ধ করিলেই উহার আয়তন হ্রস্ব এবং ভারদ্বয়ের উত্থান পতনও সুতরাং অল্প হইয়া পড়ে। যন্ত্র রচয়িতা, চূড়ান্ত আর্দ্রতা ও চূড়ান্ত শুষ্কতা * দ্বারা উক্ত ভারদ্বয় কোন্ কোন্ স্থানে যাইয়া উপনীত হয়, ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তন্মধ্যবর্ত্তি যন্ত্রাংশকে স্পষ্ট চিহ্ন দ্বারা সহস্র তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া রাখিয়াছেন। এই রূপ বিভাগ দ্বারা যে বায়ুর আর্দ্রতা বা শুষ্কতার পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইতে পারে, তাহা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন।

পানিমূল বা অব্+এনা+হল=অবেনাহল নামে উক্ত করেন, তাহাই তাঁহাদিগের এতৎ সম্বন্ধীয় গুণজ্ঞতার বিশেষ সাঙ্কেতিক প্রমাণ।

বর্ণ-ভেদ প্রকরণ।

জনক রাজার ন্যায় কাশীরাজ অজাতশত্রুও পরম জ্ঞানী ও বেদ শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন। একদা বলাকাত্মজ গার্গ্য মুনি তাঁহার সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া তাঁহার শিষ্য হইতে স্বীকার করিয়াছিলেন। তদ্ বৃত্তান্ত শতপথ ব্রাহ্মণ ও কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষদে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহার শেষ ভাগ এই স্থানে উদ্ধৃত করিলেই যথেষ্ট হইবেক।

ততো হ বালাকিস্তূষ্ণীমাস। তং হ উবাচ অজাতশত্রুরেতাবৎ নু বালাকে ইতি। এতাবদিতি হ উবাচ

* উক্ত হুল-রজ্জুর গাত্রে জল সিঞ্চন করিলেই চূড়ান্ত আর্দ্রতা এবং উহার সন্নিকটে উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড ধারণ করিলেই চূড়ান্ত শুষ্কতা উৎপাদন করা যাইতে পারে।

বালাকিঃ। তং হ উবাচ অজাতশত্রুর্ম্মৃষা বৈ খলু মা সংবাদয়িষ্ঠাঃ ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি। যোবৈ বালাকে এতেষাং পুরুষাণাং কর্ত্তা যস্য বৈ তৎ কর্ম্ম সবৈ বেদিতব্যঃ ইতি। ততো হ বালাকিঃ সমিৎপাণিঃ প্রতিচক্রমে উপায়ানীতি। তং হোবাচ অজাতশত্রুঃ প্রতিলোমরূপং এব তৎ মন্যে যৎ ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণং উপনয়েত এহি এব ত্বা জ্ঞাপয়িষ্যামীতি। তং হ পাণাবভিপদ্য প্রবব্রাজ।

তদনন্তর বালাকি নিরস্ত হইলেন। তাঁহাকে অজাতশত্রু কহিলেন, হে বালাকি! তুমি কি এই মাত্র জান? তাহাতে বালাকি উত্তর করিলেন, এই মাত্র বটে। অজাতশত্রু বলিলেন, তবে ব্রহ্ম বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলে, তাহা বৃথা হইল। হে বালাকি! যিনি এই সকল পুরুষগণের সৃষ্টি কর্ত্তা, যাঁহার সেই কার্য্য, তিনিই বেদিতব্য। অতঃপর বালাকি ভূপাল কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইবার মানসে তৎসন্নিধানে সমিৎ হস্তে উপনীত হইলেন। অজাতশত্রু কহিলেন, ইহাতে নিয়মের বিপর্য্যয় হইবেক, কিন্তু আইস আমি তোমাকে উপদেশ দিব, এই বলিয়া রাজা তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন।

প্রবাহণ জৈবলি নামক পাঞ্চাল-রাজ শ্বেতকেতু ও তৎপিতা গৌতমকে বেদ শাস্ত্র বিষয়ক বিচারে পরাভব করিয়াছিলেন; তদ্বিবরণ শতপথ ব্রাহ্মণে প্রকটিত আছে। শ্বেতকেতু পঞ্চালদিগের পরিষন্মধ্যে সমাগত হইলে রাজা প্রবাহণ তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন, ভো কুমার! তুমি কি পিতার নিকট উপদিষ্ট হইয়াছ? শ্বেতকেতু উত্তর করিলেন, হাঁ। তাহাতে রাজা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি বলিতে পার, এই সকল সৃষ্ট জীব মৃত্যুর পরে কি রূপে কোথায় গমন করে। শ্বেতকেতু কহিলেন, না আমি তাহা বলিতে পারি না। রাজা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই সকল জীব কি রূপে এই লোকে পুনরাবৃত্তি করে? যে অসংখ্য জীবগণ মরণান্তে ইহলোক হইতে পরত্র গমন করিতেছে, তাহারদিগের দ্বারা পরলোক কি জন্য পরিপূর্ণ না হয়? কোন্ আহুতির পর উদক পুরুষবাক্ হইয়া উত্থান করত বাক্যস্ফুরণ করে? হে শ্বেতকেতু! বেদে এইমত উক্ত হয় "আমি মর্ত্ত্যগণের দুই পথ শ্রবণ করিয়াছি, একটি দ্বারা দেবতাদিগকে, দ্বিতীয় দ্বারা পিতৃগণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আকাশ ও ধরা রূপী পিতা মাতার অন্তরস্থ সমস্ত জীব এই দুই পথে চলিতেছে"। এই শ্রুতি অনুসারে দেবযান ও পিতৃযান বর্ত্ম কি উপায়ে এবং কি অনুষ্ঠান দ্বারা লাভ করা যায়, তাহা কি তুমি জান? (১) শ্বেতকেতু উত্তর করিলেন, আমি এ সকলের কিছুই জানি না। অতঃপর রাজা তাঁহাকে বসিতে কহিলেন কিন্তু শ্বেতকেতু উপবেশন না করিয়া স্বীয় পিতা গৌতমের নিকট গমন করিয়া কহিলেন, হে পিতঃ! আপনি আমাকে কি রূপ শিক্ষা দিয়াছেন? রাজা আমাকে পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন, তাহার একটিরও আমি উত্তর প্রদানে সক্ষম হইলাম না। এই বলিয়া শ্বেতকেতু সেই সকল প্রশ্ন পিতার নিকট উল্লেখ করিলেন। তাহাতে গৌতম কহিলেন, হে তাত! আমি যে পর্য্যন্ত জানিতাম তৎসমস্তই তোমাকে শিক্ষা দিয়াছি কিন্তু এ সকল প্রশ্নের উত্তর আমি স্বয়ং অবগত নহি, আইস আমরা রাজার নিকট যাইয়া শিক্ষা করি। এই কথা বলিয়া গৌতম রাজা প্রবাহণের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভূপতি তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রম সম্ভাষণ পুরঃসর আসন, আহার্য্য, উদক এবং অর্ঘ্য প্রদান ক-

(১) এই সকল দুরূহ বিষয়ের আলোচনা যে অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, উপরোক্ত আখ্যানই তাহার দৃষ্টান্ত।

রিয়া কহিলেন, আপনাকে একটি বর প্রদান করিতেছি। গৌতম কহিলেন, আপনি যখন বর প্রদানে প্রতিশ্রুত হইলেন, তখন আপনি আমার পুত্রকে যে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার সদুত্তর প্রদানে আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। রাজা কহিলেন, সেটি দৈববর, তদ্ভিন্ন মানব সম্বন্ধীয় বর আপনি প্রার্থনা করুন। তাহাতে গৌতম কহিলেন, হে রাজন্! আমি বহুতর হিরণ্য গো অশ্ব দাসী প্রবর এবং পরিচ্ছদ প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আপনার অবিদিত নাই। এক্ষণে যাহা অসীম ও অনন্ত, তদ্বিষয়ে আপনি ঔদার্য্য বিহীন হইবেন না। রাজা কহিলেন, আপনি প্রকৃত পদার্থেরই ইচ্ছা করিয়াছেন। গৌতম কহিলেন, আমি শিষ্য রূপে আপনার সম্মুখীন হইতেছি, পূর্ব্ব পুরুষগণ এই রূপে গুরূপদেশ গ্রহণ করিতেন। রাজা কহিলেন, আমাকে অপরাধী করিও না। এই বিদ্যা ইতি পূর্ব্বে কোন ব্রাহ্মণই অবগত ছিলেন না কিন্তু আপনি যখন আমাকে এপ্রকারে অনুরোধ করিলেন, আমি আপনাকে তাহার উপদেশ প্রদান করিব।

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষত্রিয় জাতি কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের প্রতি উপরোক্ত প্রকার সম্ভাষণ সাতিশয় স্পর্দ্ধার লক্ষণ ও বিষম প্রত্যবায়ের কারণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অধ্যাপনা ও যাজন এই দুই কার্য্যে কেবল ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ক্ষত্রিয় তাহা অবলম্বন করিতে পারে না(২)। কিন্তু বৈদিক সময়ে এ প্রকার নিয়মের যে সৃষ্টি হয় নাই, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বাস্তবিক তখন পৌরোহিত্য কার্য্য কোন শ্রেণী বা বংশবিশেষে পর্য্যবসিত ছিল না। যে ব্যক্তি জ্ঞান ও বিদ্যার প্রভাবে অধ্যাপনা বা পৌরোহিত্য কার্য্যে নিপুণ হইতেন, তিনিই তৎকার্য্য সাধন করিতে পারিতেন। বেদের পশ্চাদ্বর্ত্তি গ্রন্থ সমূহে যে সকল পুরাবৃত্ত সংরক্ষিত আছে, তাহাতে এবিষয়ের বহুতর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়; তন্মধ্যে যাস্কক্বত নিরুক্ত গ্রন্থে দেবাপি ও শান্তনুর যে ইতিহাস আছে, তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত করা গেল। ঋষ্টিষেণ নামক রাজার দেবাপি ও শান্তনু নামক দুই পুত্র ছিলেন। পিতার মরণান্তে কনিষ্ঠ শান্তনু রাজ্যাধিকার করিলেন এবং দেবাপি তপশ্চর্য্যায় রত হইলেন। পরে শান্তনুর রাজ্যে দ্বাদশ বর্ষব্যাপি অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল, তাহাতে ব্রাহ্মণগণ রাজ সমীপে আসিয়া রাজাকে কহিলেন, আপনি জেষ্ঠ ভ্রাতাকে অতিক্রম করিয়া স্বয়ং রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া অধর্ম্মাচরণ করিয়াছেন, এই জন্যই দেবতাগণ বর্ষণ পরাঙ্মুখ। শান্তনু এই কথা শুনিয়া দেবাপিকে রাজ্য প্রদান করিতে চাহিলেন, কিন্তু দেবাপি রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া ভ্রাতাকে কহিলেন, আমি তোমার পুরোহিত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিব, তাহাতে দেবতাগণ তুষ্ট হইয়া বারিবর্ষণ করিবেন। এই প্রকারে দেবাপি রাজা শান্তনুর পৌরোহিত্যে ব্রতী হইয়া যজ্ঞারম্ভ করত বর্ষকাম নামক ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টনবতি সূক্তের রচনা করেন(৩)। দেবাপির এই ইতিহাস আধুনিক

(২) ক্ষত্রিয়স্যাপি যো ধর্ম্মস্তং তে বক্ষ্যামি ভারত। দদ্যাদ্ রাজন্ ন যাচেত যজেত ন চ যাজয়েৎ। নাধ্যাপয়েদধীয়ীত প্রজাশ্চ পরিপালয়েৎ।

শান্তিপর্ব্ব ২২৮০।

(৩) তত্র ইতিহাসমাচক্ষতে। দেবাপিশ্চ আর্ষ্টিষেণো শন্তনুশ্চ কৌরব্যৌ ভ্রাতরৌ বভূবতুঃ। স শন্তনুঃ কনীয়ানভিষেচয়াঞ্চক্রে। দেবাপিস্তপঃ প্রতিপেদে। ততঃ শন্তনোঃ রাজ্যে দ্বাদশবর্ষাণি দেবো ন ববর্ষ। তমূচুর্ব্রাহ্মণাঃ অধর্ম্মস্ত্বয়া চরিতো জ্যেষ্ঠং ভ্রাতরমন্তরিত্যাভিষেচিতং। তস্মাৎ তে দেবো ন বর্ষতীতি। স শন্তনুর্দেবাপিং শিশিক্ষ রাজ্যেন। তমুবাচ দেবাপিঃ পুরোহিতস্তেহসানি যাজয়ানি চ ত্বেতি। তস্য এতদ্ বর্ষকাম সূক্তং।

নিরুক্ত-২-১০।

ধর্ম্ম শাস্ত্রের সহিত সামঞ্জস্য করিবার জন্য পৌরাণিক গ্রন্থ সকলে তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির একটি উপন্যাস রচিত হইয়াছে। কিন্তু বেদদ্রষ্টা ঋষিগণের মধ্যে অনেকে যে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতীয় ছিলেন, ইহা আধুনিক শাস্ত্রকারেরাও স্বীকার করিয়াছেন। মৎস্য পুরাণের ১৩২ অধ্যায়ে বেদ মন্ত্র রচয়িতা সমুদয় ঋষিগণের নাম ও বংশের পরিচয় এই মত লিখিত হইয়াছে, যথাঃ— ভৃগু, কাশ্য, প্রচেতা, দধীচ, আত্মবান্, ঔর্ব্ব, জমদগ্নি, রূপ, শারদ্বত, আর্ষ্টিষেণ, যুধাজিৎ, বীতহব্য, সুবর্চাঃ, বৈণ, পৃথু, দিবোদাস, ব্রহ্মাশ্ব, গৃৎস এবং শৌনক এই উনবিংশতি ভৃগু বংশীয় মন্ত্রকৃৎ। অঙ্গিরাঃ, বেধস, ভরদ্বাজ, ভলন্দন, ঋতবাধ, গর্গ, সিতি, সঙ্কৃতি, গুরুবীর, মান্ধাতা, অম্বরীষ, যুবনাশ্ব, পুরুকুৎস, প্রদ্যুম্ন, শ্রবণাস্য, অজমীঢ়, হর্য্যশ্ব, তক্ষপ, কবি, বৃষদশ্ব, বিরূপ, কণ্ব মুদ্গল্, উতথ্য, শরদ্বৎ, রাজশ্রবাঃ, অপশ্য, সুবিত্ত, বামদেব, অজিত, বৃহদুক্থ, দীর্ঘতমাঃ, কক্ষিবান্ এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ সুবিখ্যাত আঙ্গীরস শ্রেষ্ঠ, ইহাঁরাও মন্ত্রকর্ত্তা। তৎপরে কশ্যপ বংশীয় ঋষিদিগের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। গাধি নন্দন বিশ্বামিত্র, দেবরাজ বল, মধুচ্ছন্দ, ঋষভ, অঘমর্ষণ, অষ্টক লোহিত, ভৃতকীল, বেদশ্রবাঃ দেবরাত, পুরাণাশ্ব, ধনঞ্জয়, মিথিল, এবং সানকায়ন, এই ত্রয়োদশ ব্রহ্মিষ্ঠ ঋষি কুষিক বংশীয়। মনু বৈবস্বত, ইড়, রাজা পুরুরবাঃ ইহাঁরা ক্ষত্রিয় জাতীয় মন্ত্রবাদী ছিলেন। বলন্দ, বন্দ্য এবং সংকীর্ত্তি এই তিন জন সুপ্রধান বৈশ্য জাতীয় মন্ত্রকৃৎ। সর্ব্ব শুদ্ধ একনবতি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য জাতীয় ঋষিগণ কর্ত্তৃক বেদ মন্ত্র সকল প্রকাশিত হইয়াছে।

বৈদিক সময়ে রাজন্যগণ যে ব্রাহ্মণদিগের সহিত তুল্য অধিকার ও ক্ষমতা বিশিষ্ট ছিল, তদ্বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রহিতেছে না। কিন্তু কালক্রমে ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই অপরাপর শ্রেণীর মর্য্যাদা, ক্ষমতা ও প্রভাব উত্তরোত্তর হ্রাস হইয়া আসিল। বৈদিক কালের প্রথম ভাগে যাহারা কেবল একমাত্র পৌরোহিত্য কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত, তাহারা তদুপলক্ষ্য করিয়া কি প্রকারে কাল ক্রমে সর্ব্ব প্রধান শ্রেণী রূপে পরিগণিত হইয়া সমস্ত আর্য্য সমাজের নেতা ও নিয়ন্তা হইয়া উঠিয়াছিল, তদ্বিষয়ক ইতিবৃত্ত যে পরম রমণীয় ও জ্ঞান গর্ভ হইবেক, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব আমাদের প্রস্তাবের প্রণালী ক্রমে শূদ্র বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয় বর্ণ বিষয়ক বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিয়া সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বর্ণের উৎপত্তি, ক্রমশ উন্নতি ও প্রাদুর্ভাবের বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে আমরা প্রবৃত্ত হইলাম।

নূতন পুস্তকের সমালোচন।

আমরা নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল প্রাপ্ত হইয়া স্থানাভাব প্রযুক্ত যথা সময়ে প্রাপ্তি স্বীকার বা সমালোচন করিতে পারি নাই তজ্জন্য গ্রন্থকারগণ ক্ষমা করিবেন।

১। শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী গ্রন্থ। শ্রীযুক্ত কাশীদাস মিত্র কর্ত্তৃক বঙ্গ ভাষায় বিরচিত। প্রয়াগ-দূত যন্ত্রে মুদ্রিত। শঙ্কর দিগ্বিজয় পুস্তক অবলম্বন করিয়া গ্রন্থকর্ত্তা এখানি রচনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে অনেক গুলি আবশ্যকীয় শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। শঙ্করের ভূতলে অবতরণ, শাস্ত্র বিচারে দিগ্বিজয় ও অদ্বৈত মত প্রচার প্রভৃতি সংক্ষেপে ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার ভাষা কিছু সহজ হইলে অনেক লোকের পক্ষে বিশেষ উপকারী হইত।

২। সাহিত্য মঞ্জরী। শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত। সুচারু যন্ত্রে মুদ্রিত। এই পুস্তক খানি গদ্য ও পদ্যে রচিত। ইহা বঙ্গবিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীস্থ বালকদিগের বিশেষ পাঠোপযোগী হইয়াছে। এইরূপ পুস্তক প্রণয়ন দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। ইহার ভাষা ও নির্ব্বাচন অতি প্রশংসনীয়।

৩। আর্য্য জাতির শিল্প চাতুরি। শ্রীশ্যামাচরণ শ্রীমাণী প্রণীত। রায় যন্ত্রে মুদ্রিত। প্রাচীন শিল্প কার্য্যের অনেক গুলি উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতি সহ শ্রীমাণী মহাশয় আর্য্যদিগের শিল্প নৈপুণ্যের বিষয় বিশেষ যত্ন পূর্ব্বক এই পুস্তকে বিবৃত করিয়াছেন। আমরা ইহা

পাঠ করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে।

৪। মাতালের জননীর বিলাপ। দত্ত যন্ত্রে মুদ্রিত। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তার নাম নাই। মদ্যপানের বিষময় ফল লোক সমাজে প্রচার করা রচয়িতার উদ্দেশ্য। ভাষা ও লেখা যেরূপ হউক, ইহাতে কিয়ৎ পরিমাণে গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে বলিতে হইবে।

৫। বারুইপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের চতুর্থ সাম্বৎসরিক ও রাজপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ের প্রথম সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ। মধ্যস্থ যন্ত্রে মুদ্রিত। শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরি জমিদার মহাশয়ের দ্বারা উক্ত উভয় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত। কয়েক জন প্রধান ব্যক্তি উক্ত চিকিৎসালয় দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, একটী ইংরাজী বক্তৃতার সহিত সেই সকল এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। উপরোক্ত হিতকর অনুষ্ঠান দ্বারা দীন দুঃখী লোকদিগের যে বিশেষ উপকার হইতেছে, এই পুস্তক পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের জন্য উক্ত বাবু চাউল বিতরণ করিতেছেন। এই সকল সদনুষ্ঠানের জন্য রাজেন্দ্র বাবু বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

কৃতজ্ঞতা

The Last Days in England of Rajah Ram Mohun Roy. Edited by Mary Carpenter, of Bristol.

জেলা হুগলীর অন্তঃপাতি বাক্‌সা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাধাগোবিন্দ চৌধুরি মহাশয় উপরোক্ত পুস্তক খানি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আদি ব্রাহ্মসমাজ পুস্তকালয়ে দান করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ শেষ হওয়াতে যাঁহাদিগের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা আগামী বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বৈশাখ মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ জ্যৈষ্ঠ মাস অবধি তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে অসমর্থ হইবেন।

আগামী ২০, বৈশাখ শনিবার শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের একাদশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৬॥০ ঘটিকা ও সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় ৺ কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে উপাসনা হইবেক।

আয় ব্যয়।

পৌষ, মাঘ ও ফাল্গুন ১৭২৫ শক, আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১২১৬।৶
পূর্ব্বকার স্থিত ...	৩৭২৮ ৫
সমষ্টি	১৫৮৯ ৶৫
ব্যয়	১২৯৫ ॥৶১৫
স্থিত	২৯৩ ।৶১০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩১৬ ৷১৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২৫৩ ৶
পুস্তকালয়	১২৭ ৶
যন্ত্রালয়	৩৯৭ ॥ ১৫
গচ্ছিত	১২২ ।৶১০
সমষ্টি	১২১৬।৶

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	৩১০ ৷৵ ৫
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৪৩৩৮ ১৫
পুস্তকালয়	৮৬ ৶১০
যন্ত্রালয়	২৩০ ॥ ১০
গচ্ছিত	২৩৪৸৶১৫
সমষ্টি	১২৯৫ ॥৶১৫

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০০
" কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ...	১০০
" জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	২৫
" জানকীনাথ ঘোষাল	২৫
" দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	১০
" সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় ...	১০
" প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের বাটীর মধ্যের দান ...	১৪
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	৫
" লক্ষ্মীনারায়ণ বসু ...	৪
" গোকুলকৃষ্ণ সিংহ ...	২
" দয়ালচন্দ্র শিরোমণি ...	২
" মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়	২
" হরকুমার সরকার ...	২
" পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১
" প্রসন্নকুমার বিশ্বাস ...	১
" বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ...	১
" ব্রজনাথ ধর ...	১
" হরনাথ ঠাকুর ...	১
" ক্ষেত্রমোহন ধর ...	১
" গোলোকচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ...	৷৵
দানাধারে প্রাপ্ত	৪॥৶১৫

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ...	৪
সমষ্টি	৩১৬ ৷১৫
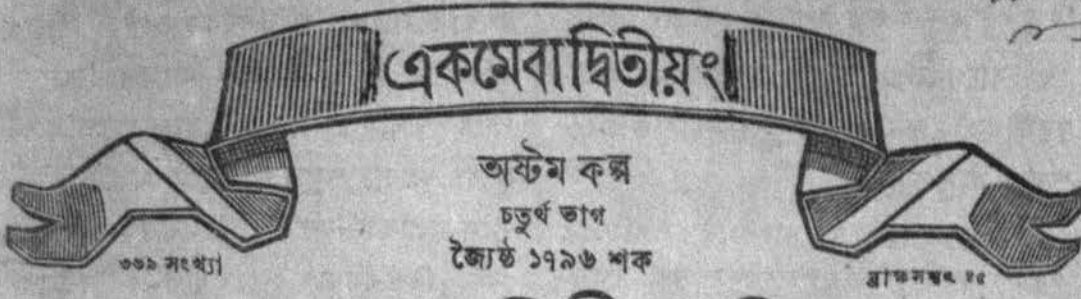
Registered No 58

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
৩৩৯ সংখ্যা　জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৬ শক　ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

প্রথম খণ্ড।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথমুপাসীত। ওমিতি হ্যুদ্‌গায়তি তস্যোপব্যাখ্যানং। ১।

'ওঁ ইতি এতৎ' পরমাত্মনোঽভিধানং নেদিষ্ঠং প্রতীকঞ্চ বর্ণাত্মকত্বাৎ 'অক্ষরং' ভক্ত্যবয়বত্বাৎ 'উদ্‌গীথং' উদ্গীথশব্দবাচ্যং 'উপাসীত' তত্রৈকাগ্র্যলক্ষণাং মতিং সন্তনুয়াৎ। ওঙ্কারস্যোদ্‌গীথশব্দবাচ্যত্বে হেতুমাহ 'ওমিতি হি উদ্‌গায়তি' ওমিত্যারভ্য হি যস্মাৎ উদ্‌গায়তি অত উদ্‌গীথ ওঙ্কার ইত্যর্থঃ। 'তস্য' অক্ষরস্য 'উপব্যাখ্যানং' এবমুপাসনমেবং বিভূত্যেবং ফলমিত্যাদি কথনং প্রবর্ত্ততইতি বাক্যশেষঃ। ১।

উদ্‌গীথ শব্দ বাচ্য ওঁকার অক্ষরের উপাসনা করিবেক, যেহেতু ওঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গান হইয়া থাকে। সেই অক্ষরের ব্যাখ্যান প্রবৃত্ত হইতেছে। ১।

এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপোরসঃ। অপামোষধয়োরস ওষধীনাং পুরুষোরসঃ পুরুষস্য বাগ্রসোবাচ ঋগ্রসঋচঃ সাম রসঃ সাম্ন উদ্‌গীথোরসঃ। ২।

'এষাং' চরাচরাণাং 'ভূতানাং' 'পৃথিবী' 'রসঃ' গতিঃ পরায়ণমবষ্টম্ভঃ 'পৃথিব্যাঃ আপঃ রসঃ' অপ্সু হি ওতা চ প্রোতা চ পৃথিবী অতস্তাঃ রসঃ পৃথিব্যাঃ। 'অপাং ওষধয়ঃ রসঃ' অপ্পরিণামত্বাৎ ওষধীনাং 'ওষধীনাং পুরুষঃ রসঃ' অন্নপরিণামত্বাৎ পুরুষস্য 'পুরুষস্য বাক্ রসঃ' পুরুষাবয়বানাং হি বাচঃ সারতমত্বং। 'বাচঃ ঋক্ রসঃ' সারতরা 'ঋচঃ সাম রসঃ' সারতরং 'সাম্নঃ উদ্‌গীথঃ রসঃ' প্রকৃতত্বাৎ ওঙ্কারঃ সারতরঃ। ২।

পৃথিবী এই সমুদায় ভূতের সার, পৃথিবীর সার জল, জলের সার ওষধি, ওষধির সার পুরুষ; পুরুষের সার বাক্য, বাক্যের সার ঋক্, ঋকের সার সাম, সামের সার উদ্‌গীথ—ওঁকার। ২।

সএষরসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধ্যোঽষ্টমো যদুদ্‌গীথঃ। ৩।

'সঃ এষঃ' উদ্‌গীথাখ্যঃ ওঁকারঃ 'রসানাং' ভূতাদীনামুত্তরোত্তরাণাং 'রসতমঃ' অতিশয়েন রসঃ 'পরমঃ' প্রকৃষ্টঃ পরমাত্মবদুপাস্যত্বাৎ 'পরার্দ্ধ্যঃ' পরঞ্চ তদর্দ্ধং স্থানঞ্চ তদর্হতি পরমাত্মস্থানার্হঃ 'অষ্টমঃ' পৃথিব্যাদিরসসংখ্যায়াং 'যদুদ্‌গীথঃ' যঃ উদ্‌গীথঃ। ৩।

সেই এই উদ্‌গীথাখ্য ওঙ্কার সকল সারের মধ্যে প্রকৃষ্ট সারতম, পরমাত্ম স্থানীয়, ইনি সার সংখ্যা গণনায় অষ্টম হয়েন। ৩।

কতমা কতমর্ক্‌ কতমৎ কতমৎ সাম কতমঃ কতম উদ্‌গীথ ইতি বিমৃষ্টং ভবতি। ৪।

'কতমা কতমা ঋক্, কতমৎ কতমৎ সাম, কতমঃ কতমঃ উদ্‌গীথঃ' বীপ্সা আদরার্থা, 'ইতি বিমৃষ্টং ভবতি' বিমর্শঃ কৃতঃ ভবতি, বিমর্শে হি কৃতে প্রতিবচনোক্তিরুপপন্না। ৪।

ঋক কি? ও সাম কি? এবং উদ্‌গীথই বা কি? এই প্রকার প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে। ৪।

বাগেবর্কপ্রাণঃ সাম ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথঃ। তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চর্ক্ চ সাম চ। ৫।

'বাগেব ঋক্ প্রাণঃ সাম' বাক্‌প্রাণৌ ঋক্ সামযোনী 'ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্‌গীথঃ' অনেন ভক্ত্যাশঙ্কা নিবর্ত্ততে 'তদ্বৈ এতৎ মিথুনং' নির্দ্দিশ্যতে, কিং তৎ মিথুনমিত্যাহ 'যৎ বাক্ চ প্রাণশ্চ' সর্ব্বক্ সামকারণভূতৌ 'ঋক্ চ সাম চ' ঋক্‌সাম কারণৌ ঋক্ সামশব্দোক্তৌ ইত্যর্থঃ।৫।

বাক্য ও ঋক্, প্রাণ ও সাম, এবং ওঙ্কার রূপ অক্ষর উদ্‌গীথ, তাহারই এই মিথুন নির্দ্দেশ, বাক্য ও প্রাণ এবং ঋক ও সাম। ৫।

বর্ষ-শেষ ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা।

৩১ চৈত্র রবিবার ১৭৯৫ শক।

যে বহমান কাল-স্রোতে বর্ত্তমান বর্ষ-বিম্ব প্রত্যক্ষ ভাসমান হইতেছিল, অদ্যকার রজনীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা অতীত-কাল-সিন্ধু-গর্ত্তে বিলীন হইতে চলিল; আমরা এখন আশা-যষ্টি অবলম্বন করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে রহিলাম! বর্ত্তমান বর্ষের সঙ্গে আমারদের যে সম্বন্ধ—যে যোগসূত্র দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, এই রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিচ্ছিন্ন হইবে। আমারদের শিক্ষা-সম্ভোগের নিমিত্ত যে সকল অপূর্ব্ব বিষয়-সামগ্রী চক্ষুর সমক্ষে বর্ত্তমান ছিল, কল্য প্রত্যূষেই কাল-সিন্ধুর নবতর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সে সমুদায়কেই অধোগামী করিয়া দিবে, আমরা বিশ্ব নিয়ন্তার আদেশ ক্রমে আবার নূতন-রাজ্যে—নূতন-ক্ষেত্রে যাইয়া উপনীত হইব।

যাহা বর্ত্তমান তাহারই উপরে আমারদের অধিকার, ভবিষ্যতের উপরে আমারদের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই, কিন্তু আমরা যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল-রাজ্যের প্রজা, তাহাতে আমরা প্রত্যেক কালে—প্রতি-অবস্থাতেই তাঁহার সন্নিধানে কেবল মঙ্গলই প্রত্যাশা করিতে পারি। যাঁহার আদেশে বীজ হইতে কাণ্ড শাখা, আবার শাখাগ্র হইতে পত্র-কলিকা, পুষ্প-ফল কাল-ক্রমে বিনির্গত হইয়া থাকে, সেই বিশ্ব-বিধাতার অব্যর্থ-বিধান-ক্রমে তেমনি ভবিষ্যৎ-কাল-গর্ত্ত বিদীর্ণ হইয়া আমারদের শিক্ষা সম্ভোগের সমুদায় নূতনবিধ উপকরণই প্রয়োজন মত বর্ষিত হইবে, এই আমারদের দৃঢ়তর আশা। এই স্বর্গীয়-আশার মৃত-সঞ্জীবনী-শক্তি প্রভাবেই বর্ত্তমানের মধ্যে থাকিয়া আমরা ভবিষ্যৎ-গর্ত্তস্থ শান্তি-মঙ্গলের প্রত্যাশা করিতেছি। শৃঙ্খল বদ্ধ অপরাধী বিচারপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যেমন ভয়-ব্যাকুলতার সহিত তাঁহার মুখ-বিনির্গত দণ্ডাজ্ঞার প্রতীক্ষা করিতে থাকে, আমরা অমৃতের পুত্র, আমরা মঙ্গল-নিদান ঈশ্বরের প্রজা, আমরা অমৃত-নিকেতনের যাত্রী, আমারদের পক্ষে ভবিষ্যৎ কাল তাদৃশ ভয়াবহ হইবার সম্ভাবনা নাই। সংসারে অসৎ, অবাধ্য, কুলাঙ্গার পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই মনুষ্য-সমাজে পিতা-মাতার বলবৎ শাসন-পদ্ধতি, কিন্তু ধর্ম্ম-পথ-হারা যথেচ্ছাচারী সন্তানকে স্বীয় নিরাপদ-ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া সংশোধিত করাই বিশ্ব-পিতা অখিল মাতা অমৃত স্বরূপ পরমেশ্বরের একান্ত আকিঞ্চন। প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা বিধান করাই পার্থিব-রাজাদিগের যার পর নাই গুরুতর কঠোরতর শাসন, শোধন করা—মৃত-প্রায় আত্মাতে প্রাণ সঞ্চার করাই মঙ্গলময় বিশ্বাধিপতির একমাত্র লক্ষ্য। গুরুতর অত্যাচারী প্রজাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব দ্বীপ দ্বীপান্তরে অজ্ঞাত কুলশীল অত্যুৎকট অপরাধী জঘন্য-প্রকৃতি চির-বন্দীদিগের মধ্যে নির্ব্বাসিত করাই

এখানকার নরপতিদিগের নিদারুণ শাসন প্রণালী; দিব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন পবিত্রাত্মা ঈশ্বর-প্রাণ দেবমণ্ডলীর মধ্যগত করিয়া পৃথিবীস্থ পাপী তাপী-অত্যাচারী সন্তানগণকে লোক-লোকান্তরে শোধিত-শিক্ষিত করাই সেই অনন্ত-উন্নতি-পথের নেতা, ত্রিভুবন পরিপালক পরমেশ্বরের কল্যাণময় আদেশ। তখন বর্ত্তমান-বর্ষের অবসানে—নববর্ষের আগমনে ভবিষ্যৎ চিন্তায় কেন আমরা ভীত শঙ্কিত হইব? ভবিষ্যতের সঙ্গে যে কেবল কল্যই আমারদের প্রথম সাক্ষাৎ হইবে তাহা নয়। কত শত ভবিষ্যৎ-দিন আমারদের নিকটে বর্ত্তমান হইয়া কত অগণ্য সুখ-শান্তি বিতরণ করিয়া এখন অতীত-কাল-গর্ভে নিহিত হইয়া গিয়াছে—কত শত দূরবর্ত্তী ভয়ঙ্কর ঘটনা-মালা প্রলয়-কাল-তুল্য অন্ধতম মেঘমালার ন্যায় গভীর গর্জ্জনে আমারদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া শুভ্র সুস্নিগ্ধ জল-ধারা-বর্ষণের ন্যায় অপর্য্যাপ্ত শান্তি-কল্যাণ বিধান করিয়া জীবন-পথের অনেক পশ্চাতে চলিয়া গিয়াছে, তাহাতে আমারদের ইষ্ট ভিন্ন কোথায় অনিষ্ট ঘটিয়াছে—মঙ্গল ভিন্ন কাহার অমঙ্গল সংসাধিত হইয়াছে? কল্যকার ভবিষ্যৎ নববর্ষের সঙ্গে, বর্ত্তমান-বর্ষের অদ্যকার রজনীর যে রূপ সম্বন্ধ, গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে, সেই রূপ এই ভূলোক, ক্রীড়া-পরায়ণ বালকের পক্ষে তেমনি যৌবন-কাল, উদ্যম-শীল জ্ঞান-ধর্ম্ম-পিপাসু যুবার পক্ষে তেমনি বার্দ্ধক্য, চলিষ্ণু বৃদ্ধের সম্বন্ধে তেমনি পরলোক। আমরা কি সকলে তাদৃশ অবস্থার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিতেছি না। যাহা এক সময়ে আমারদের সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ ছিল, তাহা কি বর্ত্তমান হইয়া পরে অতীত-কাল মধ্যে পরিগণিত হয় নাই? গর্ভাবস্থা হইতে এই বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত আমারদের শরীর-মন-আত্মা কি উন্নত পরিণত হইয়া আসে নাই? কোন বৃত্তাকার পদার্থের অংশ মাত্র দেখিয়া যখন বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত নিঃসংশয়ে সেই মূল বস্তুকে গোলাকার বলিয়া অবধারণ করেন, তখন জরায়ু হইতে বাল্য-কৌমার যৌবন-বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ক্রমাগত সকল কালে সকল-অবস্থাতে সুখ-শান্তি মঙ্গল-কল্যাণ উপভোগ করিয়া কি নিশ্চয় রূপে ঈশ্বরকে পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না? পৃথিবীর অবশিষ্ট কয়েক দিন—ইহলোক অন্তে পরলোকে কি সেই মঙ্গল-স্বরূপের স্নেহ প্রেম আলিঙ্গনের মধ্যে থাকিয়া পালিত পোষিত হইবার আশা করিতে পারি না? যখন সমস্ত জীবন একাদিক্রমে তাঁহার ঘন-নিবিড় মঙ্গলচ্ছায়ায় রক্ষিত হইয়া আসিতেছি, তখন ঐহিক মঙ্গলদাতা বিশ্ব-বিধাতাকে রত্রিকেরও শান্তি মঙ্গলদাতা বলিয়া কে না অবধারণ করিবে? যে স্নেহ-ময়ী জননী সদ্যোভূমিষ্ঠ অসহায় অকর্ম্মণ্য শিশু-সন্তানকে স্বীয় শরীর-নিঃসৃত দুগ্ধ দিয়া পালন করেন, তিনি কি সেই সন্তান দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ হইলে তাহাকে বিষ দান করিয়া থাকেন? তেমনি যখন আমরা ঈশ্বরের স্নেহ-প্রেম কিছুই জানিতাম না, তখন যিনি অকাতরে আমারদের মঙ্গল-বিধান করিয়াছেন—কোটি কোটি বিপদ-রাশি হইতে বিনা প্রার্থনায় মুক্ত করিয়াছেন; যখন আমরা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাঁহার সহিত আমারদের নিগূঢ়-সম্বন্ধ সুস্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতেছি—ভয়-প্রাপ্ত শিশুর ন্যায় যখন আমরা প্রতিদিনই বিপদ-ভয়ে আকুল হইয়া তাঁহার বিশ্ব প্রসারিত নিরাপদ-ক্রোড়ে যাইয়া নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক হইতেছি—অভাব-অনটন অনুভূত হইলে যাঁহার নিকটে মুক্ত হৃদয়ে মুক্ত রসনায় প্রার্থনা করিতেছি এবং যিনি সমুদায় ভয়-তাপ নিবারণ করিয়া

আপনার নিরাপদ-ক্রোড়ে স্থান দান করত প্রার্থনার অতিরিক্ত শান্তি-কল্যাণ বিধান করিতেছেন, ভবিষ্যৎ কালে কি তিনি আমারদিগকে বিস্মৃত হইবেন? লোকান্তরে তিনি তাঁহার রক্ষিত-পালিত সন্তানকে কি অশান্তি অকল্যাণের মধ্যে নিক্ষেপ করিবেন? আত্মার প্রাণ থাকিতে তো এ চিন্তা হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। প্রত্যুত তিনি কৃপা করিয়া প্রতি আত্মার অভ্যন্তরে যে দুর্নিবার্য্য আশা বিধান করিয়াছেন, তাহাই তো সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দীপ-গৃহের ন্যায় জ্যোতি বিস্তার করিয়া মোহময় সংসার-সাগরের ভীষণ তরঙ্গ তুফানের মধ্যেও আমারদিগকে কল্যাণের পথ প্রদর্শন করিতেছে। এই আশা কেবল মনের ক্ষণিক ভাব-মাত্র নহে, মনুষ্যের কল্পনা-শক্তিও এই আশাকে নির্ম্মাণ করে নাই। সূর্য্য হইতে যেমন কিরণ জাল বিকীরিত হইয়া মর্ত্ত্যের অন্ধকার নাশ করিতেছে, উৎস হইতে যেমন অবিশ্রান্ত বারি-ধারা নির্গত হইয়া পৃথিবীর তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে, সেই স্নেহময়ী পরম-মাতা হইতে—সেই প্রীতি-পূর্ণ বিশ্বপিতা হইতে এই আশা-রশ্মি মানব-আত্মায় বর্ষিত হইয়া তাহার মোহ-অন্ধকার বিনষ্ট করিতেছে—তাহার আন্তরিক পিপাসা শান্তি করিতেছে। এই পবিত্র আশা-প্রদীপ কোন দুঃখ-দুর্দ্দৈবে নির্ব্বাণ হয় না, কোন ঘটনা জালেও আচ্ছাদিত থাকে না।

আমরা কি কোন ক্ষুদ্র-মনুষ্যের নিকটে শান্তি-কল্যাণের আশা করিতেছি, যে, তাহার ক্ষুদ্র-ভাণ্ডার তাহা পূর্ণ করিতে পারিবে না। আমারদের প্রতি যাঁহার অনন্ত প্রেম, তাঁহারই প্রতি আমারদের অনন্ত শান্তির আশা উদ্দীপ্ত হইতেছে। সন্তানের প্রতি পিতা মাতার অকপট স্নেহ বলিয়াই পুত্র তাঁহারদের যথা-সর্ব্বস্ব আকাঙ্ক্ষা করে, শিষ্যের প্রতি আচার্য্যের অকৃত্রিম প্রীতি বলিয়াই শিষ্য তাঁহার উপার্জ্জিত সমুদায় জ্ঞান-রত্ন প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে, প্রজার প্রতি রাজার বাৎসল্য-ভাব দেখিয়াই দুঃখ-দুর্ভিক্ষে, রোগ-বিপদে রাজার শক্তি-সামর্থ্য অনুসারে প্রজা সরল-ভাবে সম্পদ সৌভাগ্য ঔষধ-পথ্য পাইবার আশা করে। যেখানে স্নেহ প্রীতি মঙ্গল-ভাব নাই, সেখানে কুত্রাপি কোন মনুষ্যের কোন আশাই থাকে না। ঈশ্বর, স্নেহ-মঙ্গলের অনন্ত-আকর, এই জন্য তাঁহার সন্নিধানে আমরা ঐহিক-পারত্রিকের অনন্ত-কল্যাণ-লাভের আশা করিতেছি। মনুষ্যের প্রতি তাঁহার অলৌকিক প্রেম, মনুষ্যেরও সেই জন্য তাঁহার প্রতি স্বর্গীয় আশা স্বতই উদ্দীপ্ত হয়। মনুষ্যের নিকটে মনুষ্য যে আশা করে, মনুষ্যের সম্বল-সঙ্গতির অল্পতা জন্যই তাহা বিফল হয়। পূর্ণ স্বরূপ পরমেশ্বরের নিকটে আমরা যে আশা করি, সেই আশাই সফল হইয়াছে, হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও সেই আশা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে।

এই আশাই মনুষ্যের জীবনী-শক্তি—এই দুর্নিবার্য্য আশাই আত্মার অনন্ত-উন্নতির পথ-প্রদর্শক। এই স্বর্গীয় আশা বিশ্ব-বিধাতা প্রতি আত্মাতে প্রেরণ করিয়া কি অপূর্ব্ব করুণাই প্রকাশ করিয়াছেন। কি বিচিত্র কৌশলেই মানব কুলকে ঐহিক পারত্রিকের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত করিতেছেন। কি কল্যাণময় বিধান ক্রমেই তিনি মনুষ্যকে বর্ত্তমানের অভাব অনটন এবং ভবিষ্যতের উন্নতি-কণ্টক সকল নির্ম্মূল করিতে সমর্থ করিতেছেন। এই আশাই পিতা-মাতাকে যথা-সর্ব্বস্ব পণ করিয়া সদ্যো-ভূমিষ্ঠ শিশু সন্তানের রক্ষণ পোষণে প্রবৃত্ত করে, এই আশাই স্বদেশ প্রেমী মহাপুরুষকে স্বীয় জন্ম

ভূমির গতি-মুক্তি জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে উপদেশ দেয়, এই আশাই জ্ঞান-পিপাসু জনগণের অরণ্য প্রান্তর নদ নদী সমুদ্র উল্লঙ্ঘন করত বিবিধ ক্লেশ সহ্য করিয়া জ্ঞান-রত্ন আহরণ করিবার নিমিত্ত উত্তেজিত করে, এই আশাই ঈশ্বর-প্রাণ সরল সাধুকে নিন্দা স্তুতির প্রতি নিরপেক্ষ হইয়া সহস্রবিধ সংসার-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সাধনে অটল উৎসাহ, অপ্রতিহত অনুরাগ প্রদান করে। আশাই প্রবক্তার রসনাকে প্রমুক্ত করিয়া দেয়, আশাই গ্রন্থকারের দারুময়ী লেখনীকে সঞ্চালিত করে, আশাই চিন্তাশীল ব্যক্তিকে মস্তিষ্ক চালনে প্রবৃত্তি দেয়, আশাই কর্ম্মীকে কর্ম্ম-ক্ষেত্রে—ধার্ম্মিককে সৎকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত করে। মনুষ্যের হৃদয়ে যদি আশা না থাকিত, সংসার দুঃখের আগার—অশান্তির আলয় হইয়া পড়িত। জ্ঞান-ধর্ম্মের উন্নতি সাধন করা দূরে থাকুক, এখানে প্রাণ-ধারণ করাই মনুষ্যের পক্ষে যার পর নাই ক্লেশকর হইয়া উঠিত। আশা যষ্টিই মনুষ্যকে সংসার যন্ত্রণার মধ্যে অটল ভাবে রক্ষা করে। আশাই এখানে অবসন্ন হৃদয়কে প্রসন্ন করে, আশাই দীন দরিদ্র নিরাশ্রয় মনুষ্যকে আশ্রয় প্রদান করে, আশাই শোকার্ত্তের সন্তাপাশ্রু মোচন করিয়া দেয়, এই আশারূপ ধ্রুবতারার প্রতি মনশ্চক্ষু স্থির রাখিয়া মনুষ্য এখানে কি কঠোর পরিশ্রমই না করে, কি নিষ্ঠুর আঘাতই না সহ্য করে, কি অসাধ্য সাধনেই না প্রবৃত্ত হয়। এই আশা প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে মনুষ্যের আর মনুষ্যত্ব থাকে না, জীবনের মধুরতা অন্তরিত হয়, জনসমাজের বন্ধন-শৃঙ্খল ছিন্ন হয়, পৃথিবীর শ্রী-সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়, আত্মার নির্ভর-যষ্টি ভগ্ন হইয়া যায়।

আশাই বন্দীর কারাবাস যন্ত্রণার লাঘব করে, আশাই নির্ব্বাসিত ব্যক্তির সান্ত্বনা বিধান করে, আশাই রোগীর রোগ-যন্ত্রণাকে লঘু করিয়া দেয়, আশাই ব্যাকুল আত্মাতে শান্তি আনয়ন করে, আশাই মৃত্যু-শয্যায় সর্ব্বত্যাগী মনুষ্যকে পরলোক—ব্রহ্মলোকের প্রতি—সেই শান্তি-নিকেতনের প্রতি অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত করিতে উপদেশ দেয়। আশাই পাপী-তাপীকে ঈশ্বরের শান্তিপ্রদ শীতল-ক্রোড়ে আনয়ন করে। আশাই অদ্য এখানে আমারদিগকে আনয়ন করিয়াছে। দেখ! সকলে প্রত্যক্ষ দেখ! আজ আমারদের আশা এখানে পূর্ণ হইতেছে কি না। আমরা পাপ-ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া আশা-পূর্ণ-মনে এখানে উপস্থিত হইয়াছিলাম, করুণা-নিধান কেমন বিচিত্র কৌশলে আমারদের হৃদয়-ভার লঘু করিয়া দিতেছেন। কেমন অজস্রধারে করুণা-বারি বর্ষণ করিয়া আমারদের মনের মালিন্য বিদূরিত করিতেছেন। তাঁর মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া কেমন নিঃশব্দে আমারদের হৃদয়ের মোহ-অন্ধকার অন্তরিত করিতেছেন।

করুণা-নিধান! আমরা জীবনের প্রত্যেক ঘটনায়—প্রত্যেক কার্য্যে অন্তর-নিহিত আশাকে যখন সফল হইতে দেখিতেছি, তখন আর কোন্ প্রাণে তোমাকে বিস্মৃত হইব! তোমাকে ছাড়িয়া আর কোথায় যাইয়া শান্তি লাভ করিব! তুমি অনন্ত-প্রেম, তুমি পূর্ণ-স্বরূপ, আমারদের অনন্ত আশা তুমি বিনা আর কে পূর্ণ করিবে?

হে পরমাত্মন্! মোহান্ধ হইয়া সম্বৎসর কাল আমরা যে সকল পাপ চিন্তা, পাপালাপ, পাপানুষ্ঠান করিয়াছি; আশা-পূর্ণ হৃদয়ে তোমার সন্নিধানে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া আমারদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। ভবি-

ষাতে তোমার আদিষ্ট ধর্ম্ম পালনে আমার দিগকে নূতন বল, নূতন বীর্য্য, নব-অনুরাগ ও নব উৎসাহ প্রদান কর। আমরা যাহাতে তোমার প্রসন্নতা লাভের প্রত্যাশায় শরীর মন আত্মা সকলই সমর্পণ করিতে পারি, আমারদিগকে এরূপ প্রসাদ বিতরণ কর, সকলে যোড়-করে তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

বেদান্ত-দর্শন।

বেদান্ত-দর্শন দ্বৈত অপেক্ষা অদ্বৈতের পক্ষপাতী—ইহা কি তাঁহার উচিত? বেদান্ত ইহার এই রূপ উত্তর দেন যে, জড় অপেক্ষা জ্ঞানের পক্ষপাতী হওয়া যদি উচিত হয়, তবে দ্বৈত অপেক্ষা অদ্বৈতের পক্ষপাতী হওয়া উচিত না হইবে কেন? জ্ঞানের বা আত্মার একত্ব এবং জড়ের অনেকত্ব সর্ব্ববাদি-সম্মত; সুতরাং যাঁহারা জ্ঞানের পক্ষপাতী, তাঁহারা যে অদ্বৈতের পক্ষপাতী হইবেন. ইহা বিচিত্র নহে। কি তবে বিচিত্র? না যাঁহারা জ্ঞানের পদতলে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দিতে প্রস্তুত, যাঁহারা জ্ঞান-লাভকে সকল লাভের প্রধান লাভ বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, তাঁহারা যে সময়ে সময়ে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া জ্ঞান অপেক্ষা জড়ের পক্ষপাতী হন, একত্ব অপেক্ষা অনেকত্বের পক্ষপাতী হন, একাগ্রতা অপেক্ষা বিক্ষেপের পক্ষপাতী হন, অদ্বৈত অপেক্ষা দ্বৈতের পক্ষপাতী হন, ইহাই বিচিত্র।

জড় অপেক্ষা জ্ঞানের পক্ষপাতী হওয়াকে যদি দোষ বলা যায়, তবে সে দোষ বেদান্তের যৎপরোনাস্তি আছে। প্রতিপক্ষ ব্যক্তি এস্থলে বলিবেন যে, জ্ঞানের ঐকান্তিক পক্ষপাতী হওয়াতে কোন যে দোষ আছে তাহা আমরা বলি না, আমারদের বক্তব্য কেবল এই মাত্র যে,যেমন উহাতে কোন দোষ নাই, তেমনি উহাতে কোন ফলও নাই; প্রকৃতির আলোচনা দ্বারা আমরা যেমন হাতে হাতে ফল পাই, জ্ঞানের আলোচনা দ্বারা তাহার কণাংশও পাই না—লাভের মধ্যে হয় এই যে, আমরা সাংসারিক সকল কার্য্যের বাহির হইয়া পড়ি। যাঁহারা এই রূপ বলেন, তাঁহারদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, প্রকৃতির আলোচনা এবং জ্ঞানের আলোচনা এ দুয়ের মধ্যে একটি স্বকপোল-কল্পিত প্রাচীর প্রতিষ্ঠা করিতে তোমাদের যেরূপ আগ্রহ, সত্যের সার্ব্বভৌমিক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিতে তোমারদের সেরূপ আগ্রহ না হয় কেন? সত্যকে এত ভয় কর কেন? সত্যের সেবায় রত হইলে কার্য্যের বাহির হইতে হইবে—ইহা ভয়ের বিষয় বটে; কিন্তু সে ভয় কি রূপ? না যেমন গুরুর নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিতে যাওয়া বালকের পক্ষে ভয়ের বিষয়, উহাও সেইরূপ। সন্তান-স্নেহের বশতাপন্ন হইয়া মাতা কখন কখন এইরূপ বলিয়া থাকেন যে. "আমার পুত্র মুর্খ হইয়াই বাঁচিয়া থাকুক, বিদ্যা শিক্ষার কঠোরতাতে উহার কাজ নাই" ইত্যাদি; সেই রূপ কোন কোন দয়াদ্র্চিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন যে, দুর্ব্বল মনুষ্য এই যাহা করিয়াছে, যথেষ্ট করিয়াছে; বাষ্পীয় যান নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাড়িত বার্ত্তাবহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, বাষ্পীয় শকট নির্ম্মাণ করিয়াছে, সুন্দর বসন ভুষণ পরিচ্ছদ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছে,—মনুষ্য এত করিয়াছে.আর কি করিবে? এই দেখ কেমন একটি বিজ্ঞানের অট্টালিকা পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মাগণ দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে,—ইহার অভ্যন্তরে সুখে স্বচ্ছন্দে কাল যাপন কর! তোমার অভাব কি? তিন বৎসর পরে যে গ্রহণ হইবে অদ্য তুমি

তাহা গণনা করিয়া বলিতে পার—তুমি আর কি চাও! বায়ুর মধ্যে কি কি বস্তু কি কি পরিমাণে আছে, তাহা তোমার নখ-দর্পণ—আর কি চাও? মনুষ্য দেহে কয় খণ্ড অস্থি আছে, তাহা তোমার মুখাগ্রে—আর কি চাও? আহা তোমার দুর্ব্বল শরীর, দুর্ব্বল মন,—তোমাকে বিনীত ভাবে বলিতেছি যে কূটস্থ সত্য, অনন্ত জ্ঞান, এ সকলের দিকে যাইও না যাইও না, পরমাত্মা আছেন ত আছেন, নাই ত নাই, তাঁহাতে তোমার কিছুই আইসে যায় না।

এইরূপ নিষ্ঠুর দয়ার নিদর্শনে যদি মনুষ্যের মন ভুলিবার পাত্র হইত, তবে একটি স্বর্ণ নির্ম্মিত শৃঙ্খল দ্বারা মনুষ্যের চরণ-যুগল বন্ধন করিয়া, তাহাকে অনায়াসে এই বলিয়া ভুলান যাইতে পারিত যে, তোমাকে আমি স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করাইতেছি। মনুষ্যের মন বলিতেছে যে, "কারণ" জানিতে পারিলে "কার্য্য" কেমন স্পষ্ট রূপে জানা যাইতে পারে! তুমি তাহাকে এই বলিয়া থামাইতেছ যে, কারণের দিকে যাইও না—কার্য্য সকল এবং তদীয় নিয়ম-সকল অবগত হইয়া সুখ-স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কর! কি দয়া! মনুষ্যের মন বলিতেছে যে যদি সুগভীর জ্ঞানের উপর জগৎ সংসার প্রতিষ্ঠিত না হয়, তবে একটি বালুকার সেতুর উপরে জগৎ সংসার প্রতিষ্ঠিত! কোথায় সে জ্ঞান-প্রেম-মঙ্গল-সত্য রূপ আত্মার তৃপ্তি স্থল! তুমি বলিতেছ তিনি থাকুন বা না থাকুন তাহাতে তোমার প্রয়োজন নাই! কি দয়া! যে-মনুষ্যের মন বলিতেছে "আমি আমার জ্ঞানকে প্রস্ফুটিত করিতেছি, প্রেমকে বিস্তৃত করিতেছি, আত্মাকে মঙ্গল-কার্য্য দ্বারা ক্ষয়যুক্ত করিতেছি—ইহাতে আমার আত্মা লঘু-ভার, সুপ্রসন্ন, এবং আনন্দময় হইতেছে; আমার আত্মা এখন প্রকৃত-রূপে আত্মা হইতেছে; আমি যাহা পাইয়াছি তাহার বৃদ্ধি বই ধ্বংস নাই!" যে-মনুষ্যের মন এইরূপ বলিতেছে, তাহাকে তুমি বলিতেছ যে, ধ্বংস হইল-হইল তাহাতে ক্ষতি কি? এক জন জন্মান্ধ ব্যক্তি চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিকে বলিতেছে যে, তুমি অন্ধকারময় গুহাভ্যন্তরে অবস্থিতি করিলেই বা, তাহাতে ক্ষতি কি?

জিজ্ঞাস্য এই যে, জ্ঞানের পক্ষপাতী হওয়াতে বাস্তবিক কোন ফল আছে কি না? যদি থাকে, তবে সে ফল কি রূপ? প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এক্ষণে বিজ্ঞান-রাজ্যের এরূপ একটি স্থানে উত্তীর্ণ হইয়াছেন যে, তথা হইতে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে পশ্চাতের অধিকার-সকলকে গাঢ়তর রূপে আয়ত্ত করা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। যত তাঁহারা অগ্রসর হইতেছেন, ততই তাঁহাদের মনে-হইতেছে যে, প্রকৃতির নিগূঢ়-তত্ত্ব জানিতে-যাওয়া কিছু নহে—তাহা অপেক্ষা গুটি-কত প্রাকৃতিক নিয়ম যাহা আমরা জানি, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল। চিকিৎসকেরা এক্ষণে আপনারদিগের ব্যবসায়ের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা বীত-রাগ হইয়াছেন; তাঁহারা অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আমরা অন্ধকারে ইষ্টক নিক্ষেপ করিয়া থাকি। রসায়ন-বিদ্যায় যাঁহারা পারদর্শী, তাঁহারা এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, এত পরিশ্রম করিয়া আমরা যৌগিক বস্তু সকলকে শীর্ণ-বিশীর্ণ করিয়া তাহাদিগকে কতিপয় মূল বস্তুতে পরিণত করিলাম, কিন্তু যখনই আমরা সেই মূল বস্তুগণের সংযোগ-দ্বারা পুনর্ব্বার সেই যৌগিক বস্তু সকল উৎপাদন করিতে যাই, তখনই আমরা বাধা প্রাপ্ত হই। এইরূপ নানা প্রকার বাধা বিঘ্ন দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এক্ষণকার প্রকৃতি-তত্ত্ববিৎ

পণ্ডিতগণ এই প্রকার মনঃস্থ করিয়াছেন যে, বিভিন্ন পণ্ডিত বিভিন্ন-জাতীয় বিদ্যার অনুশীলনে যেমন ব্যাপৃত আছেন, তেমনি থাকুন, কিন্তু তদ্ব্যতীত, তাঁহারদের আর একটি কর্ত্তব্য এই যে, সকল-জাতীয় বিদ্যাকে তাঁহারা একত্র সঙ্গৃহীত করিয়া তাহারদের মধ্যে কাহার সহিত কাহার কি রূপ সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করেন; ইহা করিতে পারিলে যাবতীয় বিদ্যার জ্যোতি একত্র পুঞ্জীভূত হইয়া পুরোবর্ত্তী বৈজ্ঞানিক পথের বিস্তর অন্ধকার অপহরণ করিবে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের এই যে একটি সংকল্প ইহা অতি আধুনিক; কিন্তু ইহারি মধ্যে তাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে বিজ্ঞান-রাজ্যে আলোচ্য বিষয়-সকলকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া আলোচনা করাই প্রথা ছিল; পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের প্রসাদাৎ আলোক উত্তাপ তাড়িত প্রভৃতি পদার্থ-সকলকে পরস্পর হইতে যত দূর পৃথক্ রূপে আলোচনা করা যাইতে পারে তাহার কিছু মাত্র ত্রুটি হয় নাই; কিন্তু এক্ষণে, বৈজ্ঞানিকদিগের মতে পূর্ব্বকার সে প্রথা পরিবর্ত্তন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে, বল, আলোক, উত্তাপ, তাড়িত, এসকলের মধ্যে এরূপ একটি সমজাতীয় সম্বন্ধ সপ্রমাণ হইয়াছে যে, বল কখনও আলোক মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, কখনও উত্তাপ-মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, কখনও তাড়িত-মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে; আলোক কখনও উত্তাপ মূর্ত্তি, কখনও তাড়িত মূর্ত্তি, কখনও বল-মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে; ইত্যাদি প্রকারে এ উহার মূর্ত্তি ধারণ করত (বালকদিগের লুকাচুরির ন্যায়) ক্রীড়া করিতেছে; ইহাই আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের পরীক্ষিত সিদ্ধান্ত। বৈজ্ঞানিকদিগের অত্যন্ত আধুনিক এই যে প্রথা, ইহা যে এখনই জ্ঞানীজনের সকল আশা পূর্ণ করিবে, ইহা অসম্ভব; কিন্তু ভবিষ্যতে তাহা যে করিবে, ইহার সুস্পষ্ট নিদর্শন নানা দিক্ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

যেমন আলোক উত্তাপ প্রভৃতি পদার্থসকল এক-যোগে আলোচিত হইতে পারে, সেই রূপ, জ্ঞান এবং প্রকৃতি উভয়ে এক-যোগে আলোচিত হইবার কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। জ্ঞান ঐক্যের একমাত্র প্রতিষ্ঠা-ভূমি; সুতরাং যখন সকল বিদ্যার মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে, তখন জ্ঞানকে ছাড়িয়া দিলে কি রূপে চলিতে পারে? কোন অরাজক দেশকে যখন রাজ-শাসনাধীন করিবার প্রস্তাব হইতেছে, তখন রাজাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত না করিলে তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। প্রকৃতির যত কিছু নিয়ম-প্রণালী তাহা জ্ঞানেতে আয়ত্ত করিবার প্রস্তাব হইতেছে, অথচ "জ্ঞান কিছুই নহে, প্রকৃতিই সর্ব্বস্ব" এইরূপ একটি ভান করিয়া, জ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে কি অমনি বিদ্বান্ ব্যক্তি তথা-হইতে সরিয়া দাঁড়ান্। জ্ঞানের প্রণালী যদি আয়ত্ত করিতে পারা যায়, তবে তাহাই যে প্রকৃতির প্রণালী! জ্ঞানের প্রণালী যত-টুকু আয়ত্ত করিতে পারিবে, প্রকৃতির সমগ্র প্রণালী ততটুকু আয়ত্ত করিতে পারিবে। তাহা না করিয়া যদি প্রকৃতিকে ভাগ ভাগ করিয়া দেখিতে যাও, তবে প্রকৃতির সমগ্র প্রণালীর পরিবর্ত্তে তাহার আংশিক প্রণালী-বিশেষ অবগত হইয়াই আপনাকে কৃতকৃত্য বোধ করত নিশ্চিন্ত থাকিবে। সে কি রূপ? না আকর্ষণী-শক্তি বা আলোক বা উত্তাপ ইহারদের মধ্য হইতে কোন-একটিকে মনোনীত করিয়া তাহার একটি প্রতিমা-স্থাপন করিবে এবং সেই প্রতিমার পূজা করিবে; অথচ মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিবে যে,

আমি জ্ঞানকেই পূজা করিতেছি। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সূর্য্যকে সৌর জগতের সিংহাসনে অভিষিক্ত করা না হইয়াছিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত জ্যোতির্বিদ্যা চক্র এবং উপচক্রের সংখ্যা-বাহুল্যে নিতান্তই প্রপীড়িত ছিল, কিন্তু যে মাত্র সূর্য্যকে সর্ব্বোচ্চ আসন দেওয়া গেল, তৎক্ষণাৎ তদীয় আলোক-প্রভাবে সে-সকল যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহার চিহ্ন মাত্রও রহিল না। সূর্য্যকে যেমন সৌর জগতের উপর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, জ্ঞানকে সেইরূপ প্রকৃতির উপর প্রাধান্য দেওয়া উচিত কি না, এবং তাহার ফলই বা কি, ইহা অতঃপর বিবেচনা করা যাইতেছে।

আর্য্য ঋষিদিগের যোগ-সাধন পদ্ধতি।

৩৬৭ সংখ্যক পত্রিকার ২৫০ পৃষ্ঠার পর।

(৭) ধ্যান—ইহা যোগের সপ্তমাঙ্গ। বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ রূপে নিরোধ পূর্ব্বক একমাত্র আত্মতত্ত্ব চিন্তা করাই ইহার উদ্দেশ্য। এই ধ্যান করিবার সময় যোগীদিগকে মস্তক, গ্রীবা ও দেহ উন্নত করিয়া এবং বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সকল সম্পূর্ণ রূপে নিরোধ করিয়া দিবা রাত্র স্থিরভাবে উপবেশন করিতে হয়। আত্মার চৈতন্য সাধনই এই রূপ ধ্যানের লক্ষ্য। এই ধ্যান সাধন নিমিত্ত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহা এই—

(১) কোন প্রকার স্থিরাসনে উপবেশন করিয়া ধীরে ধীরে এবং নিঃশব্দে ১৭২৮০০০ বার ওঁ শব্দ উচ্চারণ ও তাহার অর্থ চিন্তা করিবে।

(২) দিবা রাত্র নাসাগ্রে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিবে।

(৩) দিবা রাত্র ভ্রূ মধ্যস্থিত প্রদেশে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখিবে।

কথিত আছে যে,এই রূপ ধ্যানের অবস্থায় যোগীগণ দিব্য দৃষ্টি দ্বারা সকল পদার্থ ও সকল বিষয়ের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত অবগত হইতে পারেন এবং পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারেন।

মহর্ষি শুকদেব বলেন, যিনি ১ দণ্ড ২৬ পল পর্য্যন্ত শ্বাস রোধ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া থাকিতে পারেন, তিনিই ধ্যান দ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার উপযুক্ত।

৮ সমাধি—ইহা যোগের অষ্টম বা শেষাঙ্গ। যোগশাস্ত্রে এইরূপ উক্ত আছে যে, সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, কি শীত কি উষ্ণতা,কি সুখ কি দুঃখ,কিছুই যোগীদিগের নিকট অনুভূত হয় না। ঐ সময়ে তাঁহাদের শরীরে প্রহার কর, অস্ত্রাঘাত কর,আর অগ্নি প্রদানই বা কর, কিছুতেই তাঁহাদের ক্লেশানুভব হয় না। তাঁহারা ঐ অবস্থায় সর্ব্ব প্রকার লোভ, ভয়, রাগ, মানাপমান বোধ এবং শারীরিক ও মানসিক কার্য্য কলাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সদানন্দচিত্ত হয়েন। তাঁহাদিগের নিকট হীরক স্বর্ণ বা প্রস্তর মৃত্তিকা, শ্রদ্ধা বা ঘৃণা, শত্রু বা মিত্র, সকলই সমান। প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলে যেমন নদীর জল উর্ম্মিময় হইয়া উঠে, শরীরে নিশ্বাস প্রশ্বাস বহমান থাকিলে মনও সেইরূপ নানা দিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। আবার যেমন বায়ু-প্রবাহ স্থির হইলে উর্ম্মি সকল জলের সহিত বিলীন হইয়া যায়, শ্বাস-ক্রিয়া রুদ্ধ হইলে মনও সেই রূপ নিশ্চল হইয়া উঠে। এই উপমার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যোগীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে অনুষ্ঠান দ্বারা শ্বাস-ক্রিয়ার নিরোধ সাধন করা যায়, তাহা

দ্বারাই মনের সর্ব্বাঙ্গীন স্থৈর্য্য সম্পাদিত হইতে পারে। সমাধি লাভের নিমিত্ত যে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকটিত হইল।

(১) কেবল কুম্ভক অভ্যাস করিবে। এই কুম্ভক সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে ইহা দ্বারা শরীর সর্ব্ব প্রকার রোগ-বিমুক্ত ও দীর্ঘায়ু হয় এবং আত্মা সকল পাপ, সকল অন্ধকার ও জড়তা হইতে বিমুক্ত হইয়া দিব্য চৈতন্য সম্পন্ন ও সমাধি লাভের উপযুক্ত হয়। ভূগর্ভে আবাস নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে যিনি অধিক কাল বাস করেন নাই, এবং যিনি শুদ্ধ মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই, তিনি এই কুম্ভক সাধনে সফল প্রযত্ন হইতে পারেন না। ইহার অভ্যাস নিমিত্ত যোগীগণ প্রত্যেক অষ্ট দিবসান্তর এক এক বার করিয়া ১৯২ দিবস জিহ্বার নিম্নস্থিত সূত্র ২৪ বার ছেদন করেন এবং প্রত্যেক বার ছেদনের পর প্রতি দিন দুই বার করিয়া সাত দিবস পর্য্যন্ত দুগ্ধ, ঘৃত এবং কষায় ও লবণাক্ত দ্রব্যাদি দ্বারা উহা উত্তম রূপে দোহনবৎ মার্জ্জন করেন। এই কুম্ভক অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে ছয় মাস পর্য্যন্ত তাঁহারা ভূগর্ভে বাস করিয়া শুদ্ধ মাত্র দুগ্ধ পান করেন এবং ক্রমশঃ আহার-পরিমাণ অল্পতর করিয়া ফেলেন। শীত ঋতুর প্রারম্ভে যখন জিহ্বাগ্র অধঃকরণ করিয়া তদ্দ্বারা শ্বাস পথ রোধ করিতে সমর্থ হয়েন, তখন তাঁহারা এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত শুদ্ধ ঘৃত ও দুগ্ধ সেবন করেন এবং তাহার পর দুই এক দিবস পর্য্যন্ত কিছুই আহার বা পান করেন না। এই সময়ে তাঁহারা সিদ্ধাসনে সমাসীন হইয়া দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক তদ্দ্বারা পাকস্থলী ও ফুস্‌ফুস্ পূর্ণ করেন, জিহ্বাগ্র অধঃকরণ করিয়া তদ্দ্বারা শ্বাস-পথ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ করেন এবং ভ্রূ মধ্যস্থিত প্রদেশে দৃষ্টি স্থির করিয়া রাখেন। এই রূপ কুম্ভককেই কেবল কুম্ভক কহে।

(২) অবিরত ২০৭৩০৬০০০ বার নিঃশব্দে ওঁ শব্দ উচ্চারণ এবং তাহার অর্থ চিন্তা করিবে।

(৩) একাদিক্রমে দ্বাদশ দিবস পর্য্যন্ত উক্ত কুম্ভক দ্বারা শ্বাস-ক্রিয়া রোধ করিতে পারিলে সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হইবে।

মহর্ষি শুকদেব বলেন যে যিনি একাদিক্রমে ৩দণ্ড ৩৬পল পর্য্যন্ত শ্বাস রোধ করিয়া থাকিতে পারেন, তিনি অল্পায়াসেই সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে যোগীদিগের আর ক্ষুধা তৃষ্ণা বা নিদ্রা কিছুই থাকে না। তখন তাঁহারা কি মনন, কি বাক্য, কি কর্ম্ম কিছুতেই পাপানুষ্ঠান করেন না; ফলতঃ তখন তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে নিষ্পাপ হয়েন। কেহ কেহ বলেন যে শ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া রোধ করিলেই সমাধি লব্ধ হয়, কিন্তু কেহ কেহ আবার তাহা অস্বীকার করিয়া বলেন যে চিত্ত-বৃত্তি সকল নিরোধ পূর্ব্বক জ্ঞান যোগে পরব্রহ্মের সহিত স্থায়িরূপে যুক্ত হওয়াই সমাধির একমাত্র লক্ষণ।

ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

সাংখ্য দর্শন।

মনুষ্যের বুদ্ধি দুই প্রকার। অজন্যা ও সম্পাদ্যা। আহার নিদ্রা ভয় প্রভৃতি যাহার বিষয়, সেই বুদ্ধি মনুষ্যের অভ্যাস ব্যতিরেকেও জন্মে, এজন্য উহার নাম অজন্যা। যাহা অভ্যাস দ্বারা সম্পাদন করিতে হয়, তাহাকে সম্পাদ্যা বুদ্ধি বলে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা এই সম্পাদ্যা বুদ্ধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া থাকেন। জ্ঞান ও বিজ্ঞান। যে বুদ্ধি মোক্ষ বিষয়িণী অর্থাৎ আত্মা কি?—ঈশ্বর কি?—জগৎ কি?—এই মোক্ষোপযোগি

প্রশ্ন ত্রয়ের তত্ত্ব যে বুদ্ধির বিষয়, তাহার নাম জ্ঞান, আর তন্নির্ণায়ক শাস্ত্রের নাম জ্ঞান-শাস্ত্র। শিল্প বা শিল্পোপযোগী বস্তু-শক্তি যে বুদ্ধি দ্বারা গৃহীত হয়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতেরা তাহাকে বিজ্ঞান শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকেন, আর তত্তৎ গ্রন্থকে বিজ্ঞান শাস্ত্র গ্রন্থ বলিয়া থাকেন। "শাস্ত্রমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞান-বিজ্ঞানতৎপরঃ।" "মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রযোঃ।" "দর্শন" এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ জ্ঞান। যদি দর্শন শব্দের প্রকৃত অর্থ জ্ঞান হইল, তবে দর্শন শাস্ত্র বলিলে আমরা এই অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি যে, যে শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বের নির্ণয় আছে, তাহাই দর্শন শাস্ত্র। দর্শন শাস্ত্র জ্ঞান শাস্ত্র একই বস্তু। (ভারতবর্ষীয় জ্ঞান শাস্ত্রের মধ্যে প্রসঙ্গ বশতঃ বিজ্ঞান শাস্ত্রেরও প্রবেশ দৃষ্ট হয়) ভারতবর্ষে যত প্রকার দর্শন শাস্ত্র আছে, তত্ত্বাবত্তের মত এক রূপ না হইলেও, মুক্তি (অবস্থা বিশেষ) অংশে কাহারও বিবাদ নাই। কেবল মুক্তির স্বরূপ ও মুক্তির উপায়, এই দুই অংশেই সম্পূর্ণ বিবাদ। কেহ কেহ মুক্তির স্বরূপ ও কারণ নির্দ্ধারণ করিতে গিয়া, ঈশ্বর মানেন—বেদ মানেন—অদৃষ্ট মানেন। কেহ বা ঈশ্বর মানেন না, অদৃষ্ট মানেন, বেদও মানেন। কেহ বা কিছুই মানেন না। যাঁহারা বেদ মানিলেন না, তাঁহারা নাস্তিক-খ্যাতি প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহারা বেদ মানিলেন, তাঁহারা ঈশ্বর না মানিলেও আস্তিক থাকিলেন। সাংখ্য শাস্ত্রকার কপিল, ঈশ্বর মানেন না। প্রচলিত ক্রিয়া কাণ্ড যাঁহার মত, সেই মীমাংসা দর্শনকার জৈমিনিও ঈশ্বর মানেন না, তথাপি ইহাঁরা আস্তিক। কেবল একমাত্র বেদের মর্য্যাদা-বলে ইহাঁরা নাস্তিক অপবাদ হইতে মুক্ত আছেন। আর বৌদ্ধ চার্ব্বাক প্রভৃতিরা বেদ অমান্য করিয়াই নাস্তিক অপবাদ প্রাপ্ত হইলেন। ফল, বিবেচনা করিতে গেলে, ঈশ্বর অস্বীকার কারীরাই নাস্তিক। যাহাই হউক, প্রকৃত প্রস্তাবে বিবেচনা করিতে গেলে—আস্তিক ও নাস্তিক উভয় দর্শন মিলিত করিলে, সমুদায়ের সংখ্যা পাঁচ হয়। আস্তিক দর্শন ৩, ও নাস্তিক দর্শন ২। প্রাচীন আর্য্য গ্রন্থেও এইরূপ সিদ্ধান্ত দেখা যায়। অষ্টাদশ বিদ্যা গণনা স্থলে সাংখ্যকে ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে গণনা করিয়া "মীমাংসা ন্যায়এব চ" মীমাংসা ও ন্যায় এই দুইটিকে পৃথক্ করিয়া বলিয়াছেন। আবার স্থানান্তরে, "নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং" সাংখ্যের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং আস্তিক দর্শন তিনই প্রধান। তবে যে ষড় দর্শন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, কেবল প্রসিদ্ধি নহে, গ্রন্থভেদ ও স্থানে স্থানে গণনা ভেদও দৃষ্ট হয়; তাহার সংগতি এইরূপ—সাংখ্য২, কাপিল ও পাতঞ্জল। ন্যায় ২, গৌতম ও কাণাদ। মীমাংসাও ২, পূর্ব্ব ও উত্তর।

নাস্তিক দর্শনেরও এই রূপ প্রস্থান ভেদ আছে—যথা, প্রধানত, চার্ব্বাক ও বৌদ্ধ এই প্রস্থানদ্বয়। তন্মধ্যে দুই প্রকার চার্ব্বাক ও চারি প্রকার বৌদ্ধ। দেহাত্মবাদ ও দেহাতিরিক্ত দৈহিক পরিণাম বিশেষ বাদ এই প্রস্থানদ্বয় চার্ব্বাক ও দিগম্বর সম্মত। শূন্যবাদ, ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদ, ক্ষণিকানুমেয় বাহ্য বস্তু বাদ এবং প্রত্যক্ষ ক্ষণিক বাহ্য বস্তু বাদ,—এই চারি প্রস্থান বৌদ্ধ সম্মত। সমুদায়ে দ্বাদশ দর্শন।

এই সকল দর্শনের উৎপত্তিকাল, বা অগ্র পশ্চাৎ ভাব নিঃসন্দিগ্ধ রূপে নির্ণয় করা যায় না, কারণ, এতৎ সম্বন্ধে কোন লিখিত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। অনুমান করিয়া নির্ণয় করাও সুকঠিন, কেন না, পরস্পর দর্শনের প্রতি পরস্পরের কটাক্ষ

দৃষ্টি দেখা যায়। যদি এক সময়েই সমুদায় দর্শনের জন্ম কল্পনা করা যায়,তবেই ওরূপ ঘটনা সম্ভব হয়, নচেৎ হয় না। আবার সমসাময়িক কল্পনা করাও যায় না, কেন না, পরস্পর দর্শনের লিখন ভঙ্গী ও পুরাণাদি আখ্যায়িকা গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, দর্শনকারেরা বিভিন্ন সময়ের লোক এবং তাঁহাদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ অগ্র পশ্চাৎ ভাব আছে। যখন ব্যাসদেবের জন্ম হয় নাই, রামায়ণ তখন বর্ষীয়ান্, এই রামায়ণে মহর্ষি কপিলের উল্লেখ দেখা যায়। ঐরূপ গৌতমেরও উল্লেখ আছে। এইরূপ দর্শনের লিখন গতি অন্বেষণ করিলে দেখা যায় "ন বয়ং ষট্পদার্থবাদিনোবৈশেষিকাদিবৎ" কপিল বৈশেষিক কণাদকে কটাক্ষ করিতেছেন। ঔৎপত্তিক সূত্রে জৈমিনি "বাদরায়ণস্যানপেক্ষত্বাৎ" বাদরায়ণকে পূজা করিতেছেন, আবার ব্যাসও "অধিকারং জৈমিনিঃ" জৈমিনিকে স্মরণ করিতেছেন, "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" এই বলিয়া পাতঞ্জলকেও খণ্ডন করিতেছেন। গৌতমও "মহদনুগ্রহণাৎ" এই সূত্র দ্বারা কপিলকে লক্ষ্য করিতেছেন। কণাদও গৌতমের সহিত নিরন্তর স্পর্দ্ধা করিতেছেন। এই সকল দেখিয়া বলিতে হয় যে, দার্শনিক ইতিহাস নির্ণয় করা সহজ নহে। বিশেষত কাল নির্ণয় করিবার ত কোন উপায়ই নাই। বরং চেষ্টা করিলে ১, ২, করিয়া ব্যাস পর্য্যন্ত যাওয়া যাইতে পারে, তাঁহার ওদিকে আর বৎসর নাই, কেবল যুগ। দ্বাপর, ত্রেতা, সত্য। অতএব দার্শনিক ইতিবৃত্ত, গ্রন্থ পীঠ মধ্যে সন্নিবেশিত করিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তবে যাহা কিছু বলা যায়, তাহা কেবল মনের বেগ নিবৃত্তি করা মাত্র।

পৌত্তলিকতা।

৩৬৮ সংখ্যক পত্রিকার ১৩ পৃষ্ঠার পর।

আমরা এই পত্রিকার গত সংখ্যায় এই বিষয়ে যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা আমরা এই বলিয়া উপসংহার করিয়াছিলাম যে উপরে যাহা কথিত হইল, তাহা হইতে আমরা দুই উপদেশ প্রাপ্ত হইতেছি। প্রথম উপদেশ এই যে পৌত্তলিকদিগকে একেবারে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট মনে না করি, দ্বিতীয় উপদেশ এই যে পৌত্তলিকতা বিষয়ে নিজে আমাদিগের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। এই দুই উপদেশ বিবৃত করা বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

পৌত্তলিকদিগকে ধর্ম্মভ্রষ্ট জ্ঞান না করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। যখন ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিক উভয়ই ঈশ্বরের স্বরূপ উপাসনা করিতে সক্ষম হয়েন না, উভয়ই প্রতিরূপের উপাসনা করেন,তখন পৌত্তলিককে কিরূপে ধর্ম্মভ্রষ্ট জ্ঞান করা যাইতে পারে। ঈশ্বরের পূর্ণতা বিষয়ে ব্রাহ্মের মত পৌত্তলিকের মত অপেক্ষা মহৎ ও উচ্চ, কিন্তু ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিক উভয়ই ঈশ্বরকে পূর্ণস্বভাব বলিয়া বিশ্বাস করেন। অতএব পৌত্তলিককে কখন ধর্ম্মভ্রষ্ট জ্ঞান করা কর্ত্তব্য হয় না। ধর্ম্মের প্রধান উপাদান দেবভক্তি, তাহা উভয়েরই আছে, অতএব পৌত্তলিক ধর্ম্মশূন্য ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? কিন্তু পৌত্তলিক ধর্ম্ম রাজ্যের অতি নিম্ন প্রদেশে অবস্থিত। এক দৃষ্টিতে ব্রাহ্ম ও পৌত্তলিকের মধ্যে অনেক প্রভেদ। ব্রাহ্ম যে প্রতিরূপের উপাসনা করেন, তাহা ঈশ্বরের স্বরূপ হইতে অনেক পরিমাণে হীন, তাহা বুঝিতেছেন। কিন্তু পৌত্তলিক প্রতিরূপকেই ঈশ্বর মনে করেন এবং সেই প্রতিরূপকে সৃষ্ট পদার্থ অথবা সৃষ্ট গুণ সমন্বিত বলিয়া কল্পনা করেন। ইহাতেও তিনি ক্ষান্ত হয়েন না, সেই কল্পিত প্রতিরূপের আবার দৃশ্যমান

প্রতিরূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজায় প্রবৃত্ত হয়েন। প্রত্যেক পৌত্তলিকের কর্ত্তব্য যে ধর্ম্মের এই হীন অবস্থা হইতে আপনাকে উত্থিত করেন। প্রত্যেক পৌত্তলিকের কর্ত্তব্য যে চিরকাল সোপানে অবস্থিতি না করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান রূপ ছাদে আরোহণ করিতে চেষ্টা করেন। অনেক পৌত্তলিক এরূপ আছেন যে পৌত্তলিকতা মিথ্যা ইহা জানিয়াও তাহার অনুষ্ঠানে নিমগ্ন থাকেন—পৌত্তলিকতাকে বাল্যক্রীড়া জানিয়াও সেই বাল্যক্রীড়াতে রত থাকেন। তাঁহারা প্রৌঢ় হইয়াও বাল্য ক্রীড়ার মোহ পরিত্যাগ করিতে পারেন না। ব্রহ্মজ্ঞান রূপ আলোক তাঁহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবেশ করিতে প্রার্থনা করে কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক মনোমন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখেন, সে আলোককে তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে দেন না। তাঁহারা বিবেচনা করেন না যে এপ্রকার আচরণ জন্য তাঁহারা ধর্ম্মদ্বারে দোষী।

পৌত্তলিকতা বিষয়ে আমাদিগের নিজের সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। কেবল দৃশ্যমান পুত্তলিকার উপাসনা পরিত্যাগ করিলেই যে ব্রাহ্মোচিত কার্য্য হইল, এমত নহে; উপাসনার সময়ে ঈশ্বরকে কোন রূপবিশিষ্ট অথবা পরিমিত স্থানব্যাপী বলিয়া উপাসনা করা উচিত নহে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উক্ত হইতেছে যে কেহ কেহ উপাসনার সময় ঈশ্বরকে জ্যোতির্ম্ময় বলিয়া ভাবেন। কিন্তু তিনি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নহেন; তিনি জ্যোতির জ্যোতি, সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া দীপ্তি পাইতেছে, অতএব তিনি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ নহেন। সকল ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা জ্ঞান আলোচনা হইতে কখন বিরত না হয়েন। ঈশ্বর বিষয়ে তাঁহাদিগের যে বর্ত্তমান জ্ঞান আছে, সে জ্ঞানকে সর্ব্বদা আলোচনা ও অনুশীলন দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও উন্নত করিতে চেষ্টা করা তাঁহাদিগের অতীব কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যদি এ প্রকার জ্ঞানচর্চ্চা না থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উপধর্ম্ম অচিরাৎ ব্রাহ্মধর্ম্ম মধ্যে প্রবেশ করিবে। কেবল অন্ধ ভক্তি দ্বারা মনুষ্য মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় না; জ্ঞান ও ভক্তি উভয়ের সংযোগ ব্যতীত কেহ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হয় না। ব্রাহ্মদিগের এই বিষয়েও সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য যে রূপক বর্ণনার অযথা নিয়োগ দ্বারা ঈশ্বরের মহিমাকে না হ্রস্ব করেন ও তদ্দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মে উপধর্ম্ম আনয়ন না করেন। এই বিষয় আমরা এই পত্রিকার পূর্ব্ব এক সংখ্যায় লিখিয়াছি, অতএব এখানে তাহা বাহুল্য রূপে প্রতিপাদন করিবার আবশ্যকতা নাই।

বর্ণ-ভেদ প্রকরণ।

শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপণ দ্বারা অনেক স্থলে যে তৎপ্রতিপাদিত বস্তুর প্রকৃতি ও পুরাবৃত্ত বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা ব্রাহ্মণ শব্দের উদাহরণে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইবেক। ব্রাহ্মণ শব্দের মূল "ব্রহ্মণ্", এবং শেষোক্ত শব্দটি ক্লীবলিঙ্গে ব্রহ্ম এবং পুংলিঙ্গে ব্রহ্মা, এই দুই রূপই ঋগ্বেদে অতি বাহুল্য ভাবে প্রয়োগ হওয়া দৃষ্ট হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত বিরল, এমন কি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে সমগ্র ঋগ্বেদ মধ্যে উক্ত শব্দ সাত কি আটটি স্থল ব্যতীত আর ব্যবহৃত হওয়া দৃষ্ট হইবেক না। পরন্তু বেদোক্ত ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা শব্দের ভাবার্থের সহিত ব্রাহ্মণ শব্দের আদিম অর্থের যে বিশেষ সংযোগ আছে, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। অতএব উল্লিখিত ব্রহ্ম ও ব্রহ্মা শব্দ বেদে কি প্রকার

অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করিতে পারিলে ব্রাহ্মণ শব্দের আদিভূত অর্থ ও তৎসহ ব্রাহ্মণ বর্ণের উৎপত্তি বিষয়ক কথার অনেক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইবেক।

ঋগ্বেদে ব্রহ্ম শব্দে দেবতাগণের আরাধনা সূচক স্তোত্র অথবা দেব সন্নিধানে প্রার্থনা বুঝায়। বৈদিক স্তোত্র বা সূক্ত সকল যেমন অর্ক, উক্থ, ঋক্, গির্, ধী, নীথ, নিবিদ্, মন্ত্র, মতি, স্তোম ইত্যাদি বহুবিধ নামে উক্ত হইয়াছে, সেই রূপ ব্রহ্ম শব্দ তাহাদের একটি নামান্তর মাত্র। পরন্তু যে সকল সূক্ত অপেক্ষাকৃত পবিত্র বলিয়া খ্যাত, তৎসমুদায় বিশেষ করিয়া মন্ত্র ও ব্রহ্ম নামে উক্ত হয়। ব্রহ্ম শব্দ ঋগ্বেদে যে উপরোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নিম্ন লিখিত কএকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দর রূপে প্রতিপন্ন হইবেক। যথা,

ন সোমো ইন্দ্রমস্থতো মমাদ, ন অব্রহ্মানো মঘবানং সুতাসঃ। তস্মৈ উক্থং জনয়ে যজ্জুজোষন্ বন্নবীয়ঃ শৃণবদ্ যথা নঃ। উক্থে উক্থে সোমো ইন্দ্রং মমাদ নীথে নীথে মঘবানং সুতাসঃ। যদীং সবাধঃ পিতরং ন পুত্রাঃ সমান-দক্ষাঃ অবসে হবন্তে। ৭ মণ্ডল ২৬-১।

অভিষুত সোম ব্যতীত ইন্দ্রের চিত্তোল্লাস সাধন হয় না এবং স্তোত্র হীন (অব্রহ্ম) অভিষবণেও তিনি আনন্দযুক্ত হয়েন না। আমি তাঁহার জন্য একটি উক্থ রচনা করি, যাহা তাঁহার প্রীতিকর হইবেক, এবং মনুষ্যের ন্যায় সেই নূতন রচনা শ্রবণার্থে তিনি উৎসুক হইবেন। প্রত্যেক উক্থে সোমরস ইন্দ্রদেবের হর্ষ বর্দ্ধন করে। যখন স্তোতাগণ একত্র হইয়া সমবেত স্বরে পিতার সন্নিধানে সমুপস্থিত পুত্রগণের ন্যায়, ইন্দ্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে, তখন প্রত্যেক স্তোত্র সহকারে যে অভিষবণ করা হয়, তাহা ইন্দ্রের সাতিশয় আহ্লাদ জনক হয়।

বিশ্বামিত্রস্য রক্ষতি ব্রহ্মেদং ভারতং জনং।
৩ মণ্ডল ৫৩।১২।

বিশ্বামিত্রের এই স্তোত্র (ব্রহ্ম) সমস্ত ভারত জনগণকে রক্ষা করিতেছে।

এবেদন্নুকং দাশরাজ্ঞে সুদাসং প্রাবদিন্দ্রো ব্রহ্মণা বো বশিষ্ঠাঃ। ৭ মণ্ডল-৩৩,৩।

হে বশিষ্ঠগণ, তোমাদের প্রার্থনা (ব্রহ্ম) হেতু ইন্দ্র সুদাসকে দশ নৃপতির যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছেন।

উপরোক্ত কএকটি উদাহরণে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সহজেই প্রতীয়মান হইবেক, এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থলে আরো সুস্পষ্ট ভাবে তদর্থ প্রকাশ হয়; যথা

"দেবত্তং ব্রহ্ম গায়ত"। ১ম-৩৭-৪।

দেবতা প্রদত্ত স্তোত্র গান কর।

কস্য ব্রহ্মাণি রণ্যথাঃ। ৫ম-৭৪-৩।

কাহার স্তোত্র সকল তোমরা গ্রহণ কর? ইত্যাদি।

পুংলিঙ্গে ব্রহ্মা শব্দ কি অর্থে বেদে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা এক্ষণে দেখা আবশ্যক। ঋগ্বেদে বৈদিক সূক্ত রচয়িতাগণ সামান্যত ঋষি, বিপ্র, কবি, কারু, বেধাঃ ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়াছেন; এবং অনেক স্থলে তাঁহাদের ব্রহ্মা নামেও উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রথমে যাঁহারা বৈদিক কবি ছিলেন, তাঁহারাই স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠানকারী পুরোহিতেরও কার্য্য করিতেন। পরে কাল ক্রমে যজ্ঞাদির সংখ্যা বৃদ্ধি ও অনুষ্ঠান প্রণালী বহু ব্যাপৃত হইয়া পড়িলে পুরোহিতের কার্য্য স্বভাবতই স্বতন্ত্র হওয়ায় সামান্যত পুরোহিতগণ ব্রহ্মা নামে উক্ত হইতেন। (১)

---

(১) ব্রহ্মা শব্দ যে যাজক ও পুরোহিত অর্থে ব্যবহৃত হইত, তাহার আরো দুই একটি দৃষ্টান্ত এই স্থলে দেওয়া যাইতেছে।

গায়ন্তি ত্বা গায়ত্রিণো অর্চন্তি অর্কং অর্কিনঃ ব্রহ্মানস্ত্বা শতক্রতো উদ্বংশমিব যেমিরে। ১ মণ্ডল ১০-১।

গায়কগণ তোমার গান করিতেছে, স্তোতাগণ তোমার স্তুতি পাঠ করিতেছে, হে শতক্রতু, ব্রহ্মাগণ তোমাকে উদ্বংশের ন্যায় উন্নত করিয়াছে।

পরে পৌরোহিত্য কার্য্য ব্যবসায় বিশেষ হইয়া শ্রেণী বিশেষে অথবা বংশ পরম্পরায় প্রচলিত হইয়া আসিলে এবং পুরোহিতের কার্য্য বাহুল্য হওয়ায়, হোতা, অধ্বর্য্যু ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার যাজকের সৃষ্টি হইলে সর্ব্ব প্রধান পুরোহিতগণ ব্রহ্মা নামে খ্যাত হইলেন। যাঁহারা বেদ শাস্ত্রে সুশিক্ষিত ও যজ্ঞানুষ্ঠান বিষয়ে সুদক্ষ হইতেন, তাঁহারাই ব্রহ্মা নামক পুরোহিত পদ প্রাপ্ত হইতে পারিতেন, এবং তাঁহারা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান কালে যজ্ঞ স্থানে উপস্থিত থাকিয়া অপরাপর পুরোহিতগণের উপর তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব করিয়া, যাহাতে সুপদ্ধতি ক্রমে যজ্ঞের সকল অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, এবং অপরাপর পুরোহিতগণের কোন বিষয়ে ভ্রম প্রমাদ বা ত্রুটি না হয়, তৎপ্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইত। এই রূপে পৌরোহিত্য কার্য্য একটি শ্রেণী বিশেষে সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে তাহার অপ্রতিহত ফল স্বরূপ সেই শ্রেণীর মধ্যেই বেদ বিদ্যা ও ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলন ক্রমে পর্য্যবসিত হইয়া আসিল। সুতরাং আর্য্য সমাজের শৈশবাবস্থাতেই পুরোহিতগণ যে এই প্রকারে প্রভুত্ব ও প্রতিপত্তি লাভ করিবেন এবং ক্ষমতাশালী হইবেন, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি করা যাইতে পারে। বিশেষত ভারতবাসী আর্য্যগণের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি আবহমান কাল অপেক্ষাকৃত প্রবল, তাঁহাদের মধ্যে যাজক ও ধর্ম্মোপদেশকগণ যে স্বল্পায়াসে তাঁহারদের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব লাভ করিবেন, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। অপর বেদোক্ত ধর্ম্ম ক্রমে বহু ব্যাপার বিশিষ্ট যজ্ঞানুষ্ঠানে পরিণত হইয়া উঠিলে পুরোহিতগণের আধিপত্য অধিকতর রূপে বদ্ধমূল হইয়াছিল। কি ঐহিক কি পারত্রিক সকল প্রকার ইষ্ট সিদ্ধি হেতু যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রয়োজন, এবং যজ্ঞানুষ্ঠান পুরোহিত ব্যতীত হইতে পারিত না। রাজ্যে অনাবৃষ্টি আদি নৈসর্গিক অবগ্রহ উপস্থিত হইলে, তাহার উপসমনার্থে ইন্দ্রাদি দেবতাগণের আরাধনা ও সুদীর্ঘ যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান আবশ্যক হইত। যুদ্ধে জয় লাভ ও শত্রু দমনার্থে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিশেষ প্রয়োজন ছিল, ইন্দ্রাদি দেবগণ যাঁহার সহায় হন, সেই রাজাই যুদ্ধে জয়ী হইয়া থাকেন, এই সংস্কার বৈদিক আর্য্যগণের একটি অবিচলিত প্রত্যয় স্বরূপ ছিল, সুতরাং উপযুক্ত ও সুশিক্ষিত পুরোহিত প্রাপ্ত হওয়াই জয় লাভের প্রধান উপকরণ জানিয়া আর্য্য নৃপতিগণ প্রধানতম পুরোহিতগণকে অশেষবিধ সমাদর পূর্ব্বক নিজ নিজ অধিকার মধ্যে রাখিয়া স্ব স্ব কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্রতী করিবার জন্য চেষ্টা ও ব্যয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না। সুদাস ও ভারত রাজার কথা এবং বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠ ঋষির বৃত্তান্ত যাহা ঋগ্বেদে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এই বিষয়ের যথেষ্ট উদাহরণ স্থল। এই রূপে আর্য্য সমাজের প্রথমাবস্থাতেই বেদজ্ঞ ও যজ্ঞানুষ্ঠানক্ষম পুরোহিতগণ রাজার প্রধান কর্ম্মচারী ও মন্ত্রী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কি রাজ সভায় কি যুদ্ধ ক্ষেত্রে পুরোহিত ব্যতীত রাজার কোন গুরুতর কর্ম্মানুষ্ঠান অথবা মন্ত্রণা অবধারিত হইতে পারিত না। ঋগ্বেদে ভূয়ো ভূয় উক্ত হইয়াছে যে যে রাজা বেদবেত্তা ঋষিকে সম্মান পূর্ব্বক আপন গৃহে যত্ন করিয়া রাখেন, তিনি সর্ব্বদা জয় যুক্ত ও সৌভাগ্যশালী হয়েন।

ঋগ্বেদ রচনা কালেই যে পুরোহিতগণ একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী রূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা যে সামান্যত ব্রহ্মা নামে

ব্রহ্মাণাইব বিদথে উক্‌থশাসাঃ। ১ম-৩৯-১।

হে অশ্বিনদ্বয়, তোমরা যজ্ঞেতে স্তুতিপাঠক ব্রহ্মাদ্বয়ের ন্যায় ইত্যাদি।

খ্যাত হইতেন, ইহার প্রমাণ উক্ত বেদেরই স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা।—

যদিন্দ্রাগ্নী মদথঃ স্বে দুরোণে যদ্‌ব্রহ্মণি রাজনি বা যজত্রা। অতঃ পরি বৃষণাবা হি যাতং অথ সোমস্য পিবতং সুতস্য। ১ মণ্ডল ১০৮-৭।

হে সম্ভজনীয় ইন্দ্রাগ্নী! যখন তোমরা স্বকীয় আবাসে কিম্বা ব্রহ্মা অথবা রাজাতে হর্ষ যুক্ত হও, তখন হে বলবন্ত! তোমরা এখানে আগমন করিয়া অভিষুত সোম পান করিও (২)।

এই স্থানে রাজা ও ব্রহ্মা অর্থাৎ নৃপতি বংশ ও পুরোহিত বংশের প্রভেদ স্পষ্ট সূচিত হইয়াছে। বাস্তবিক অপরাপর পূর্ব্বতন সমাজের ন্যায়, আর্য্য সমাজের শৈশবাবধি এই দুইটি প্রধান শ্রেণী ছিলেন, ইহাঁরাই জন সাধারণের নেতা ও নিয়ন্তা ছিলেন। এই দুই শ্রেণী এবং বিশ্ বা বিট্ নামধেয় সাধারণ জনগণ, যাহারা পশ্চাতে বৈশ্য বর্ণে পরিণত হইয়াছিল, এই তিন শ্রেণী লইয়া স্বভাবত আর্য্য সমাজ প্রথমে সংগঠিত হয়; তৎপরে জাতি ভেদ প্রণালী বিধি বদ্ধ হইলে অন্যান্য অপকৃষ্ট জাতি এবং বৈদিক ধর্ম্ম বিবর্জ্জিত হীনপ্রভ আর্য্যগণকে লইয়া চতুর্থ বর্ণের সৃষ্টি হয়।

ব্রহ্মা নাম পুরোহিত শ্রেষ্ঠ ও নির্ব্বিশেষে পুরোহিত শ্রেণীতে প্রয়োগ হইলে পরে, সেই পুরোহিত বংশীয়গণ স্বভাবত ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হওয়া সম্ভব। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ শব্দ ঋগ্বেদে অতি বিরল, সুতরাং ইহা দ্বারা অনায়াসে উপলব্ধি হইবেক যে ঋগ্বেদ রচনা কালে স্বতন্ত্র বর্ণরূপে ব্রাহ্মণগণ পরিচিত ছিলেন না, বাস্তবিক ব্রাহ্মণ শব্দ তখন জাতি বাচক হয় নাই, পুরুষ সূক্ত ব্যতীত আর যে যে স্থানে ব্রাহ্মণ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, তথায় আনুসঙ্গিক কথার দ্বারা তাহার অর্থ ব্রহ্ম-পুত্র অর্থাৎ পুরোহিত বংশীয় ভিন্ন আর কিছুই উপলব্ধি হইতে পারে না (৩)।

(২) এই প্রকারে অন্যত্র রাজা ও ঋষি এই দুয়ের প্রভেদ সূচিত হইয়াছে। যথাঃ—

স ন জীয়তে মরুতো ন হন্যতে ন স্রেধতি ন ব্যথতে ন রিষ্যতি। নাস্য রায় উপদস্যন্তি নোতয় ঋষিং বা যং রাজানং বা সুষূদথ। ২ মণ্ডল ১০৮-৭।

হে মরুৎগণ, তোমরা যে ব্যক্তির সহায় হও, সে ব্যক্তি ঋষি হউক বা রাজাই হউক কদাপি পরাজিত বা বিনষ্ট অথবা হীন দশাগ্রস্ত হয় না, সে ক্লেশ পায় না এবং কেহ তাহার হিংসা করিতে পারে না। তাহার ধনক্ষয় বা সহায় নষ্ট হয় না।

(৩) ব্রহ্ম-পুত্র শব্দও এক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা

উদ্গাতা ইব শকুনে সাম গায়সি ব্রহ্মপুত্র ইব সবনেষু শংসসি। ২ মণ্ডল-৪৩-২।

হে শকুনে, তুমি উদ্গাতার ন্যায় সামগান কর, সবনে ব্রহ্মপুত্রের ন্যায় তুমি স্তুতি পাঠ কর।

সংবাদ।

পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তির পরিব্রজন বৃত্তান্ত।

১ মৃজাপুর। এখানে আমি একবার গমন করি। তথায় কোন সমাজ দেখি নাই।

২ গাজীপুর। গাজীপুরে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের শাখা সমাজ আছে। কিন্তু তথাকার আচার্য্য মহাশয়ের গলদেশে উপবীত বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আমি সে সমাজ দর্শন করি নাই।

৩ কানপুর। কানপুরে আমি একবার গমন করি। এখানে ব্রাহ্মসমাজ নাই। লোকদিগেরও ব্রাহ্ম ধর্ম্ম বিষয়ে কোন যত্ন দেখিলাম না। এখানে পণ্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কাশীতে একটী বৈদিক সার্ব্বভৌম পাঠশালা মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষে স্থাপন করিয়াছেন এই কথা বলেন। ঐ বিষয়ে তিনি অনেক লোকের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার কথা কহেন। ইহাঁ দ্বারা এপ্রদেশে ধর্ম্ম বিষয়ের অনেক উন্নতি হইতেছে।

৪ ফরেক্কাবাদ। ফরেক্কাবাদ কানপুর হইতে ৫২ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে কলের গাড়ী চলে না, ডাকের গাড়ীতে অথবা পদব্রজে গমন করিতে হয়। এখানে ব্রাহ্মসমাজ নাই। এখানকার লোকের যে প্রকার উৎসাহ ও যত্ন দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয় শীঘ্র ব্রাহ্মসমাজ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু প্রচারক মহাশয়েরা এখানে কখন আসেন নাই। এখানে দয়ানন্দ সরস্বতীর একটি বৈদিক পাঠশালা দেখিলাম।

Registered No 58

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

প্রথম খণ্ড।

তদেতন্মিথুনমোমিত্যেতস্মিন্নক্ষরে সংসৃজ্যতে। যদা বৈ মিথুনৌ সমাগচ্ছত আপয়তোবৈ তাবন্যোন্যস্য কামং। ৬।

'তৎ এতৎ' এবং লক্ষণং 'মিথুনং' সর্ব্বকামাপ্তিগুণবিশিষ্টং 'ওঙ্কারে' 'সংসৃজ্যতে' সংসৃষ্টং বিদ্যতে ইতি ওঙ্কারস্য সর্ব্বকামাবাপ্তিগুণবত্ত্বং। মিথুনস্য কামাপয়িতৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি দৃষ্টান্ত উচ্যতে যথা লোকে 'মিথুনৌ' মিথুনাবয়বৌ স্ত্রীপুংসৌ 'যদা' যস্মিন্ কালে 'বৈ' এব 'সমাগচ্ছতঃ' গ্রাম্যধর্ম্মতয়া সংযুজ্যেযাতাং তদা 'আপয়তঃ' প্রাপয়তঃ 'তৌ' স্ত্রীপুমাংসৌ 'অন্যোন্যস্য' ইতরেতরস্য 'কামং'। ৬।

যখন স্ত্রী পুরুষ একত্র সংযুক্ত হয়, তখন যেমন তাহারা পরস্পর পরস্পরের কামনা পূর্ণ করে, সেই রূপ এই পূর্ব্বোক্ত মিথুন ওঙ্কার রূপ অক্ষরে সংসৃষ্ট হইয়া আছে। ৬।

আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি যএতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে। ৭।

উদ্গীথোপাসকোঽপ্যুদ্গাতা তদ্ধর্ম্মা ভবতীত্যাহ 'আপয়িতা' প্রাপয়িতা 'হ বৈ' 'কামানাং' যজমানস্য 'ভবতি' 'যঃ' 'এতৎ' অক্ষরং 'উদ্গীথং' 'এবং' কামাপ্তিগুণবৎ 'বিদ্বান্' জানন্ 'উপাস্তে'। ৭।

যে ব্যক্তি এই উদ্গীথ রূপ ওঙ্কারকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি সকল কামনার প্রাপয়িতা হয়েন। ৭।

তদ্বা এতদনুজ্ঞাক্ষরং যদ্ধি কিঞ্চানুজানাত্যোমিত্যেব তদাহ, এষোএব সমৃদ্ধির্যদনুজ্ঞা, সমর্দ্ধয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি যএতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদ্গীথমুপাস্তে। ৮।

সমৃদ্ধিবাংশ্চোঙ্কারঃ কথমিত্যাহ 'তদ্বৈ এতৎ' প্রকৃতং 'অনুজ্ঞাক্ষরং' অনুজ্ঞা চ সা অক্ষরঞ্চ অনুজ্ঞানুমতিরক্ষরমোঙ্কারঃ। কথমনুজ্ঞেত্যাহ 'যৎ হি কিঞ্চ' যৎকিঞ্চিৎ লোকে 'অনুজানাতি' তত্রানুমতিং কুর্ব্বন্ 'ওমিতি এব তৎ আহ' অতঃ 'এষা উ এব' এষৈব 'সমৃদ্ধিঃ' 'যৎ অনুজ্ঞা' যা অনুজ্ঞা তস্মাৎ সমৃদ্ধিগুণবান্ ওঙ্কার-ইত্যর্থঃ। সমৃদ্ধিগুণোপাসকত্বাৎ তদ্ধর্ম্মা 'সমর্দ্ধয়িতা' 'হ বৈ' 'কামানাং ভবতি যএতদেবং বিদ্বানক্ষরং উদ্গীথং উপাস্তে'। ৮।

সেই এই ওঙ্কার অনুমতি সূচক অক্ষর, যেহেতু লোকে যাহা কিছু অনুমতি করে, তাহা ওঁ বলিয়া স্বীকার করে, অতএব ওঙ্কারের এই সমৃদ্ধি, যে ব্যক্তি এই উদগীথ রূপ ওঙ্কারকে এইরূপ জানিয়া উপাসনা করেন, তিনি সকল সমৃদ্ধির প্রাপয়িতা হয়েন। ৮।

তেনেয়ং এয়ী বিদ্যা বর্ত্ততে ওমিত্যাশ্রাবয়ত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্গায়ত্যেতস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিম্না রসেন। ৯।

ইদানীমক্ষরং স্তৌতি 'তেন' অক্ষরেণ ওঙ্কারেণ 'ইযং' 'এযী বিদ্যা' ঋগ্বেদাদিলক্ষণা 'বর্ত্ততে'। কথং, সোমযাগে 'ওমিতি আশ্রাবযতি ওমিতি শংসতি ওমিতি উদ্‌গাযতি'। তচ্চ কর্ম্ম 'এতস্যৈব অক্ষরস্য' 'অপচিত্যৈ' পূজার্থং 'মহিম্না' মহত্ত্বেন 'রসেন' ব্রীহিযবাদিরসনির্ব্বৃ-তেন হবিষা, যাগহোমাদি অক্ষরেণ ক্রিযত ইত্যর্থঃ। ৯।

এই ওঙ্কার অক্ষর দ্বারা ত্রয়ী বিদ্যা প্রবৃত্ত হয়, এবং আশ্রাব, শংসন ও উদ্‌গান ইত্যাদি কর্ম্ম এই অক্ষরের পূজা, মহিমা ও রস রূপ ঘৃত দ্বারা সম্পন্ন হয়। ৯।

তেনোভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা তু বিদ্যা চাবিদ্যা চ যদেব বিদ্যযা করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্য্যবত্তরং ভবতীতি খল্বেতস্যৈবাক্ষ-রস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি। ১০।

'যঃ চ এতদক্ষরং' 'এবং' ব্যাখ্যাতং 'বেদ' যঃ চ ন বেদ' 'উভৌ' 'তেন' অক্ষরেণ কর্ম্ম 'কুরুতঃ'। 'নানা তু বিদ্যা চ অবিদ্যা চ' ভিন্নে হি বিদ্যাবিদ্যে, 'যদেব' 'বিদ্যযা' বিজ্ঞানেন যুক্তঃ সন 'করোতি' কর্ম্ম 'শ্রদ্ধযা' শ্রদ্দধানঃ 'উপনিষদা' যোগেন যুক্তশ্চ 'তদেব' কর্ম্ম 'বীর্য্যবত্তরং' 'ভবতি ইতি' অবিদ্বৎকর্ম্মণোধিকফলং ন ভবতীতি 'খলু' 'এতস্যৈব' প্রকৃতস্য উদ্‌গীথস্য 'অক্ষ-রস্য' ওঙ্কারস্য 'উপব্যাখ্যানং ভবতি'। ১০।

যে ব্যক্তি এই অক্ষরের স্বরূপ জানে বা যে ব্যক্তি না জানে, উভয়েই তাহা দ্বারা কর্ম্ম করে, কিন্তু বিদ্যা ও অবিদ্যা ভিন্ন পদার্থ, সেই হেতু যে ব্যক্তি জানিয়া শ্রদ্ধা পূর্ব্বক যোগযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করে, তাহার বিশিষ্ট ফল লাভ হয়, এই সেই অক্ষরের ব্যাখ্যান। ১০।

সাংখ্য দর্শন।

"তদেতন্মোক্ষশাস্ত্রং চিকিৎসাশাস্ত্রবচ্চতুর্ব্যূহম্"

সাংখ্য শাস্ত্র, চিকিৎসা শাস্ত্রের ন্যায় চতুর্ব্যূহ। ব্যূহ শব্দের অর্থ সমূহ। রোগ সমূহ—রোগের কারণ সমূহ—আরোগ্য সমূহ—ভৈষজ্য সমূহ,—এই চারিটি সমূহ যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রধান প্রতিপাদ্য, তেমনি দুঃখ—দুঃখ-নিবৃত্তি—দুঃখের কা-রণ—দুঃখ-নিবৃত্তির উপায়,—এই চারিটি সাংখ্য দর্শনের প্রধান প্রতিপাদ্য। সাং-খ্যকার উক্ত চারিটি সমূহের বিলক্ষণ পরীক্ষা করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে অনেক জাগতিক (বাহ্য) পদার্থেরও পরীক্ষা করিয়াছেন। তন্মধ্যে, দুঃখ পদার্থটির পরীক্ষা করিতে প্রয়াস পান নাই। তিনি বলেন, দুঃখকে পরীক্ষারূঢ় করিবার প্রয়োজন কি?—উহা সর্ব্বদাই সকল মনুষ্যের অন্তঃকরণে চেতনা শক্তির প্রতিকূল-অনুভবে উপস্থিত হইয়া থাকে (১)। অতএব দুঃখ নাই বলিয়া কেহ প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন না, দুঃখের নিবৃত্তি হয় কি না? এ সংশয়ও কেহ করেন না, দুঃখ নিবারণের কোন উপায় নাই বলিয়াও কেহ মস্তকোত্তোলন করেন না; সুতরাং ঐ সকল অংশ প্রতিপাদন করা সাংখ্য দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। কেবল সাংখ্য দর্শনের নহে, জ্ঞাত জ্ঞাপন করা কোন শাস্ত্রেরই উদ্দেশ্য নয়। "অজ্ঞাত জ্ঞাপকং হি শাস্ত্রম্" ইন্দ্রিয়ের অগোচর বস্তুর বোধ জন্মানই শাস্ত্রের কার্য্য।

"তবে সাংখ্য দর্শনের উপদেশ্য বিষয় কি?"—যাহা সাধারণ জ্ঞানের গোচর নহে, যাহার উপদেশ অন্য কেহ করে নাই,তাহাই উপদেশ্য।

"এমন বিষয় কি আছে যাহার উপদেশ অন্য কেহ করে নাই, অথবা সহজে উপলব্ধি হয় না?—দেখা যায়, বাত-পিত্ত শ্লেষ্মাদি ধাতু বৈষম্য নিবন্ধন শারীর দুঃখ নিরাক-রণের শত শত উপায় বৈদ্যক গ্রন্থে আছে—বিষয় বিশেষের অদর্শন বা অপ্রাপ্তি নিব-ন্ধন মানস দুঃখ উপস্থিত হয়, তন্নিবারণের উপায়, মনোজ্ঞ স্ত্রী-পান-ভোজন-বস্ত্র অল-

---

(১) সাংখ্য মতে, দুঃখ একটী অন্তঃকরণের বৃত্তি মাত্র। ঐ বৃত্তি চিতি শক্তির প্রতিকূল রূপে অনুভূত হইয়া আত্মায় আঘাত করে।

ক্কার প্রভৃতি জাগতিক পদার্থও জগতে প্রচুর আছে—নীতি শাস্ত্রে কুশলতা থাকিলে, নিরুপদ্রব স্থলে বাস করিলে আগন্তুক দুঃখও হইতে পারে না—তবে আর এমন কি গুপ্ত উপায় বা বস্তু আছে, যাহা উপদেশ করিবার জন্য সাংখ্যকার ব্যগ্র ?—

দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধ হয় কি না ?—যদি হয়, তবে তাহার উপায় কি ?—এই অংশ সাধারণ জ্ঞানের বিষয় নহে, এই অংশই সাংখ্য শাস্ত্রের উপদেশ্য। যে সকল লৌকিক উপায় দৃষ্ট হয়, তদ্দ্বারা যে নিশ্চিত দুঃখ নিবৃত্তি হইবে, এরূপ নিয়ম দৃষ্ট হয় না, যদিও নিবৃত্তি হয়, তথাপি পুনর্ব্বার সেই দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। আত্যন্তিক নিবৃত্তি কদাচ হয় না। কিন্তু শাস্ত্রীয় উপায় অবলম্বন করিলে অবশ্য দুঃখ নিবৃত্তি হইবে এবং সে নিবৃত্তি আত্যন্তিক নিবৃত্তি। সাংখ্য দর্শনের মতে এই আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির নামই মোক্ষ বা স্বস্বরূপ প্রাপ্তি। ইহাকেই শাস্ত্রে পরম পুরুষার্থ বলে। মনুষ্য যে কিছু প্রার্থনা করে, দুঃখ নিবারণের জন্যই করে। দুঃখ নিবৃত্তি বা দুঃখনিবৃত্তির উপায়,মনুষ্য উভয়কেই প্রার্থনা করে, এজন্য উভয়ই পুরুষার্থ বটে ; কিন্তু লৌকিক উপায় ও লৌকিক উপায় দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি আত্যন্তিক নহে বলিয়া উহা পুরুষার্থ হইলেও পরম পুরুষার্থ নহে (২)।

জৈমিনি বা জৈমিনির ন্যায় যজ্ঞ বিদ্যাবিৎ ঋষিরা বলেন, মনুষ্য মাত্রেরই "নিরন্তর সুখই হউক, দুঃখ যেন অণুমাত্র না হয়" এই রূপ অব্যভিচারী অভিনিবেশ আছে।

(২) উক্ত অভিপ্রায় কপিলের "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" "প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বং" "সর্ব্বাসম্ভবাৎ সম্ভবেপি সত্তাসম্ভবাদ্ধেয়ঃ প্রমাণকুশলৈঃ" এই সকল সূত্রে নিহিত আছে।

অতএব ঐ রূপ অভিনিবেশের পরিপূর্ত্তি (নিরবচ্ছিন্ন সুখ-ধারা সম্ভোগ) মনুষ্যের সম্বন্ধে ঘটে কি না ?—তর্ক করিলে, ঘটেনা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। জৈমিনির মতে উহাই স্বর্গ-সুখ বলিয়া উক্ত হয়। কারণ, শাস্ত্রে বলে, "যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরং। অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃপদাস্পদম্।" নিরবচ্ছিন্ন সুখ ধারা সম্ভোগই স্বর্গ ভোগ। এই স্বর্গই মনুষ্যের সুখ তৃষ্ণার বিশ্রান্তি ভূমি। ইহাই পরম পুরুষার্থ, ইহাকেই মুক্তি বলে, ইহাকেই অমৃত ভোগ বলে। জৈমিনির মত এই—বেদোক্ত কার্য্য কলাপ, এই অলৌকিক সুখ লাভের এক মাত্র উপায়। যজ্ঞ বিদ্যা ব্যবসায়ীদিগের উক্ত মত কপিলের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। কপিল বেদ মানেন, বেদোক্ত ক্রিয়া কলাপের ফল-জননী শক্তিও স্বীকার করেন, কিন্তু উক্ত প্রকারে স্বীকার করেন না। বলেন, কর্ম্মসাধ্য স্বর্গ সুখও ঐহিক সুখের ন্যায় দুঃখ মিশ্র ও অনিত্য, কারণ যাগ মাত্রই হিংসা সাধ্য। পশুঘাত বা বীজ বিনাশ ব্যতিরেকে কোন যাগই নিষ্পন্ন হয় না। সুতরাং হিংসা ঘটিত কার্য্য কি রূপে নিরবচ্ছিন্ন শুভ ফল প্রসব করিতে পারে—(১) তাদৃশ সুখের কারণ ক্রিয়া কাণ্ড কদাচ হইতে পারে না। হিংসাদি দোষ রহিত বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানই তাদৃশ সুখের কারণ (২)।

অপিচ, যেমন কোন উপায় বিশেষ

(১) সাংখ্য মতে,বীজ বিনাশ করিলেও পাপ জন্মে। কিন্তু অজ-বীজ ভিন্ন। যে বীজ হইতে আর অঙ্কুর হয় না, সেই বীজের নাম অজ। অহিংসা ঘটিত ব্রতে এই অজ বীজের ব্যবস্থা আছে। ৩ বৎসর, যত্ন বিশেষে রক্ষিত হইলে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত বীজের অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তি থাকে।

(২) "নাদৃষ্টাদপি তৎসিদ্ধিঃ—" "অবিশেষশ্চোভয়োঃ" এই দুই কপিল সূত্রে উক্ত অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে।

দ্বারা দুঃখ বিশেষ কিছু কাল স্থগিত থাকে, আবার কোন উপায় বিশেষে তদপেক্ষা অধিক কাল স্থগিত থাকে,—এবং কোন উপায়ে এক প্রকার দুঃখের শান্তি হয়, কোন উপায়ে বা দুই বা ততোধিক দুঃখের শান্তি হয়, তেমনি কোন না কোন উপায়ে সকল দুঃখের শান্তি হইতে পারে এবং সে শান্তি অনন্ত কালের জন্য হইতেও পারে।

দুঃখের কারণ ধ্বংশ করিতে পারিলে, দুঃখ উৎপত্তি কেন হইবে?—যে উপায়ে উক্ত পুরুষার্থ সিদ্ধ হইবে, সে উপায় লোক মধ্যে নাই, যজ্ঞ বিদ্যার মধ্যেও নাই, কেন না, সে উপায় কেবল তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞানের আকার—"আমি, মহৎ-অহঙ্কার-ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্তু হইতে অত্যন্ত ভিন্ন ও চিৎ স্বরূপ পুরুষ"—এইরূপ প্রত্যয় দৃঢ় ও সাক্ষাৎকার হওয়া আবশ্যক। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাকে তত্ত্বজ্ঞান, সত্ত্বপুরুষান্যতাপ্রত্যয় ও বিবেক খ্যাতি বলে। এই প্রত্যয় উৎপাদনের নিমিত্ত আত্মা ও জগৎ এই বস্তুদ্বয়ের যথার্থ রূপ কি?—তাহার অন্বেষণ করিতে হয়, দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া তত্ত্ব-অনুশীলন করিতে করিতে উক্ত প্রত্যয় জন্মিতে পারে।

আত্মা জগৎ এই উভয়েরই পরীক্ষা করিতে হইবে। তন্মধ্যে জগৎ পরীক্ষা প্রথম (বাহ্য বস্তু পরীক্ষা) তাহাতে কপিলের মত এই যে, জগতের তত্ত্ব সমুদায়ে চতুর্বিংশতি, আর আত্মতত্ত্ব এক এই পঁচিশটী মাত্র তত্ত্ব। তন্মধ্যে জগৎ যে চতুর্বিংশতি তত্ত্বের সমষ্টি—তাহার ব্যষ্টি এই—মুল প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, রূপ তন্মাত্র, রস তন্মাত্র, গন্ধ তন্মাত্র, স্পর্শ তন্মাত্র, শব্দ তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও মহাভুত পাঁচ।

কপিল, স্বপ্রতিজ্ঞাত এই সকল পদার্থকে আজ্ঞা বাক্যের ন্যায় স্বীকার করিতে বলেন না। তিনি বলেন, পদার্থ সকল পরীক্ষায় আরোহণ করাও—প্রমাণ সহ হইলে গ্রহণ করিও। অতএব প্রকৃতি কি?—পুরুষ কি?—মহৎ কি?—অহঙ্কার কি?—এ সকল জিজ্ঞাসা এক্ষণে নিবৃত্ত রাখিয়া তদ্দ্বারা যে বস্তু নিশ্চয় হইবে তাহারই চিন্তা কর—

তরঙ্গের ন্যায় সর্ব্বদাই মনুষ্যের অন্তরে জ্ঞান প্রবাহ উত্থিত হইতেছে, স্থিত হইতেছে লয় হইতেছে। সকল জ্ঞানই বিষয়কে অবগাহন করিতেছে। "সর্ব্বং জ্ঞানং সবিষয়ং" জ্ঞান মাত্রই কোন না কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া উদয় হয়। কোন বস্তু অবগাহন করিতেছে না, অথচ জ্ঞান হইতেছে, এরূপ কখনই হয় না। উন্মত্ত ব্যক্তি ভিন্ন ওরূপ বলিতে কেহই পারেন না। অতএব জ্ঞান মাত্রেরই কোন না কোন বিষয় আছে, বিষয় মাত্রেরই জ্ঞান আছে। জ্ঞান আছে বিষয় নাই—বিষয় আছে জ্ঞান নাই; এরূপ দৃষ্ট হয় না। বিষয় বলিলে জ্ঞানাবগাহিত বিষয় বুঝিতে হইবে, জ্ঞান বলিলে বিষয় যুক্ত জ্ঞান বুঝিতে হইবে। শব্দ ও অর্থের যেরূপ অবিযুক্ত সম্বন্ধ,—জ্ঞান ও জ্ঞেয় এ দুইএরও সেইরূপ সম্বন্ধ।

এখন বিবেচনা করুন—সাগরের তরঙ্গমালার ন্যায় নিরন্তর উত্থিত নানাবিধ জ্ঞান-প্রবাহের মধ্য হইতে কোন্‌টি ঠিক্‌ জ্ঞান তাহা চিনিয়া লইতে হইবে। অতএব ঠিক্‌ জ্ঞানের লক্ষণ কি?—ইহাতে কপিল এই রূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন—অনধিগত ও অবাধিত বস্তু অবগাহী ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। মর্ম্ম এই—অনধিগত অর্থাৎ যে বস্তু আর কখন জ্ঞানের বিষয় হয় নাই—অবাধিত অর্থাৎ জ্ঞানোত্তর কালে যাহার বাধ (বিলয়) হয় না—ব্যবসায়াত্মক অর্থাৎ "ইহা অমুক বস্তু" এই রূপ নিশ্চয়াত্মক যে জ্ঞান তাহাই ঠিক জ্ঞান। সংস্কৃত ভাষায় এই যথার্থ জ্ঞান "সম্যক্‌

জ্ঞান, প্রমা, প্রমিতি, অনুভব প্রভৃতি নামে উল্লিখিত হইয়া থাকে।" এই প্রমাজ্ঞান, স্বীয় বিষয় হইতে কদাচ ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না, প্রমাজ্ঞানের বিষয় কখন বাধিত হইতে দেখা যায় না। (১) যে বস্তু এক বার জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে, সেই বস্তু যদি বারান্তরে বিষয় হয়, তবে তাহাকে প্রমা না বলিয়া "স্মৃতি" বলা যায়। কাহারও মতে উক্ত যথার্থ জ্ঞানের স্মৃতি এবং অনুভব এই দুইটি ভাগ নিষ্প্রয়োজন। ইহাঁদের মতে শুদ্ধ কেবল অবাধিত বস্তু অবগাহী জ্ঞান মাত্রই প্রমা শব্দের বাচ্য। বিভাগ বাদীর মতে বিভাগের প্রয়োজন পশ্চাৎ ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে যাহা প্রমা হইবে না, ঈদৃশ দুই একটি জ্ঞান অবলম্বন করিয়া প্রমাকে স্পষ্ট রূপে উপলব্ধি করিতে হইবে। মন্দান্ধকার নিমগ্ন একটি রজ্জু অথবা জল ধারা দেখিয়া আমাদের কখন কখন সর্প জ্ঞান জন্মে, সে জ্ঞান প্রমা নহে, কেন না সেই সর্পাকার জ্ঞান সবিষয়, সর্প হইতে ব্যভিচার প্রাপ্ত হয়, সে সর্পটিও বাধিত বস্তু। কারণ, "এইসাপ্" এই জ্ঞানের অব্যবহিত উত্তর কালেই যদ্যপি দণ্ডোদ্যম পূর্ব্বক আঘাত করিতে যাই, তবে সে সর্প আর থাকে না। সর্পের সঙ্গে সঙ্গে সর্পাকার জ্ঞানও বিলয় প্রাপ্ত হয়। তখন জ্ঞানের ব্যবসায়াত্মক অংশ সত্যকেই গ্রহণ করে, অর্থাৎ "ইহা সর্প নহে—ইহা জলধারা বা রজ্জু" এই রূপ নিশ্চয় জ্ঞান জন্মে। কিন্তু "ইহা সর্প নহে" এই জ্ঞানের বাধ বা ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না, সুতরাং এই অংশেই প্রমা আর বিপরীত অংশে ভ্রম। এই রূপ, সংশয় জ্ঞানও প্রমা নহে। কারণ সংশয় স্থলে বুদ্ধিবৃত্তি বিভিন্ন বস্তু গ্রহণ করিতে থাকে, তাহাতে ব্যবসায় জন্মে না "ইহা অমুক? কি অমুক?—এই আকারে দোদুল্যমান হইতে থাকে। যাবৎ না বুদ্ধি একতর গামিনী হয়; তাবৎ কি প্রমা, কি ভ্রম কিছুই বলা যায় না। এই রূপ আকারের জ্ঞানকে সংশয় নামে ব্যবহার করা যায়। এতাবতা, জ্ঞানের "স্মৃতি" "প্রমা" "ভ্রম" "সংশয়" স্থূলত এই চারিটি বিভাগ করা হইল। তন্মধ্যে, প্রমাজ্ঞানই বিশেষ বিচার্য্য বলিয়া তাহার মূল অনুসন্ধান করা আবশ্যক।

উক্ত প্রমার উৎপত্তি কি রূপে হয় এবং উৎপত্তির সাক্ষাৎ কারণই বা কি?—কপিল এই সকল জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি প্রসঙ্গাধীন করিয়াছেন কিন্তু সংক্ষেপে, যথা—"দ্বয়োরেকতরস্য বাপ্যসন্নিকৃষ্টার্থপরিচ্ছিত্তিঃ প্রমা তৎ সাধকং সৎ তত্ত্রিবিধং প্রমাণং।" কিন্তু আচার্য্যেরা ইহাকে বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন।

যদ্দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে উক্ত প্রমা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রমাণ, এই প্রমাণ দ্বারাই বস্তুর পরীক্ষা সিদ্ধি হয়, বস্তুকে প্রমাণারূঢ় করার নামই পরীক্ষা। এক্ষণে এই জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, প্রমাণ কত প্রকার। এক প্রকার?—কি বিভিন্ন প্রকার?—কপিল মতানুযায়িরা উত্তর দেন যে, যখন দেখা যাইতেছে বস্তু নানা বিধ এবং অতীতাবস্থা, অনাগতাবস্থা ও বর্ত্তমানাবস্থা, নানাবিধ অবস্থাক্রান্ত বস্তুর পরীক্ষা হওয়া আবশ্যক (যখন বস্তু মাত্রেরই তিনটি অবস্থা—এবং বর্ত্তমান অবস্থার পরীক্ষা দৃষ্ট হইতেছে, অতীত অবস্থারও দৃষ্ট হইতেছে, তখন অনাগত অবস্থারও পরীক্ষা সাধক কোন না কোন সামগ্রী থাকিতে পারে।) তখন, স্থূল সূক্ষ্ম দৃশ্যাদৃশ্য বহুগুণযুক্ত জগতের পরীক্ষার জন্য যে একটি সামগ্রী উপস্থিত থাকিবে, এমত সম্ভব হয় না। জগতের কোন বস্তুই অখণ্ড দণ্ডায়মান নহে, সুতরাং যে কালে পরীক্ষিতব্য বস্তু বর্ত্তমান আছে, সে

(১) ভ্রম জ্ঞান স্থলে বিষয়ের বোধ হয়—তদ্দৃষ্টে এখানে অবাধিত শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

কালে পরীক্ষা সাধক সামগ্রীটি না থাকিতেও পারে, যে কালে পরীক্ষা বর্ত্তমান, সে কালে পরিক্ষিতব্য না থাকিতেও পারে, এ রূপ হইলে পরীক্ষা পদার্থটি অপ্রতিষ্ঠিত হইয়া পড়ে। আরও এক বিবেচনা আছে। পরীক্ষা কার্য্যটিকেও জগদন্তঃপাতী স্বীকার করিতে হইবে, না করিলে, জগতের অসম্পূর্ণতা আপত্তি হয়। অতএব জগৎ যেমন নানা, তেমনি প্রমাণও নানা। (১)

প্রমাণের সংখ্যাঘটিত অনেক মত আছে। কেহ ১, কেহ ২, কেহ ৩, কেহ ৪, কেহ ৫, কেহ বা ৬, প্রমাণ স্বীকার করেন। কপিল ৩ প্রমাণ বাদী। ঐন্দ্রিয়ক ১, যৌক্তিক ২, ঔপদেশিক ৩, এই তিন প্রকার জ্ঞানের উৎপাদক ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ সংস্কৃত জ্ঞান ও ভ্রমাদি দোষ রহিত সত্য বাক্য এই তিনটি। ইহার নামান্তর প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, শাব্দ। ইহার মধ্যে প্রত্যক্ষ সর্ব্ববাদি সম্মত, ইহাতে কাহারও আপত্তি দেখা যায় না, এই বলিয়াই হউক, আর প্রমাণান্তরের জীবন স্বরূপ বলিয়াই হউক, প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে যে কিছু বিচার্য্য আছে, তাহার অবধারণ সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়ের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ই সর্ব্ব প্রধান সুতরাং প্রথমত চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিচারণায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

জাতি-ভেদ বিষয়ে বর্ত্তমান আন্দোলন।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র সকল অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে সর্ব্ব প্রথমে ভারতবর্ষে জাতি বিভেদ বংশগত ছিল না ব্যবসায় ও চরিত্রগত ছিল এবং পরে বংশগত হইলেও চরিত্রানুসারে ব্যক্তির উন্নতি বা অবনতি হইত। এই পত্রিকার পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। যখন জাতি বিভেদ সম্পূর্ণ রূপে বংশগত হইল, তখন তাহা হইতে নানা অনিষ্ট উৎপন্ন হইতে লাগিল। সেই সকল অনিষ্টের প্রতি লোকে বিরক্ত হইয়া তাহার প্রতিকারের নিমিত্ত চেষ্টান্বিত হইল। জাতি বিভেদ প্রথা অসাধারণ ধীশক্তি ও বৈরাগ্য সম্পন্ন পরম সাহসিক ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কারক বুদ্ধদেবের নিকট হইতে প্রথম আঘাত প্রাপ্ত হয়। রামানন্দ, কবীর, নানক, দাদু, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্ম্মসংস্কারকেরা জাতিভেদ প্রথা নির্ম্মূল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণ হিন্দু সমাজ বুদ্ধ হইতে চৈতন্য পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধর্ম্ম সংস্কারকের মত অবলম্বন করিল না। তাঁহাদিগের মতাবলম্বী ব্যক্তিরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে ও সাধারণ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে জাতি বিভেদ প্রথার এক প্রবল শত্রু প্রাদুর্ভূত হইয়াছে ; সেই শত্রু ইংরাজী শিক্ষা। পূর্ব্বে এমন প্রবল শত্রুর সঙ্গে ইহার কখন যুদ্ধ করিতে হয় নাই। এক্ষণে এই অত্যন্ত বলবান শত্রুর সঙ্গে উহার বিলক্ষণ সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামের ফল কিরূপ দাঁড়ায়, তাহা এক্ষণে স্পষ্টরূপে স্থির করিয়া বলা যাইতে পারে না। এই রূপ বোধ হইতেছে যে ইংরাজীশিক্ষা জাতিভেদ প্রথাকে একেবারে নির্ম্মূল করিতে না পারুক, তাহার বর্ত্তমান আকার অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিবে, সন্দেহ নাই।

জাতি-ভেদ প্রথা লইয়া এক্ষণে হিন্দুসমাজে মহা আন্দোলন চলিতেছে। কেহ কেহ উহাকে একেবারে উঠাইয়া দিতে চান ; কেহ কেহ উহাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে

---

(১) "ন প্রত্যক্ষনিবৃত্তিমাত্রাদভাবনিশ্চয়ঃ" বিদ্যমানোপার্থ ইন্দ্রিয়াণাং কালভেদেন বিষয়োঽবিষয়শ্চ ভবতি "সম্ভবতি বাত্রান্যৎ প্রমাণং।"

পারেন না; আবার কেহ কেহ উহা রাখিতে চান কিন্তু উহার বর্ত্তমান আকার পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক। এই তিন মতের প্রত্যেক মতাবলম্বী ব্যক্তিরা তর্কের সময় যে যে যুক্তি ব্যবহার করেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে, তাহার মধ্যে কোন্ মতটি অধিকতর যুক্তি-যুক্ত, তাহা পাঠকবর্গ অনায়াসে স্থির করিতে পারিবেন।

যাঁহারা বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথাতে বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন চান না, তাঁহাদিগের যুক্তি এই যে পিতৃ পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন করা উচিত হয় না। সামাজিক রীতি যদি পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহা হইলে লোক সমাজে অত্যন্ত বিশৃঙ্খল ঘটিবার সম্ভাবনা, অতএব পিতৃ পিতামহ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সন্তুষ্ট থাকাই কর্ত্তব্য। পরিবর্ত্তনের স্রোত আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই, অতএব পুরাতন প্রথা পরিবর্ত্তন করা কর্ত্তব্য নহে।

যাঁহারা জাতিভেদ প্রথা একেবারে উঠাইয়া দিতে চান, তাঁহাদিগের যুক্তি এই যে ঈশ্বর যখন সমস্ত মনুষ্যের পিতা স্বরূপ, তখন তাহারা সকলে পরস্পর ভ্রাতা; অতএব এক জনের পক্ষে আর এক জনকে নিকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া ঘৃণা করা অত্যন্ত অন্যায়। এক প্রকার শোণিত সকলেরই শিরাতে প্রবাহিত হইতেছে; এক প্রকার মানসিক বৃত্তি সকলেরই অন্তরে কার্য্য করিতেছে। এক জন মনুষ্য আর এক জনকে হীন বলিয়া বিবেচনা করা কখনই তাহার পক্ষে উচিত হয় না। নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি উপযুক্ত হইলে জাতিভেদ প্রথা তাহার উন্নতির পথে নানা প্রতিবন্ধক নিক্ষেপ করে। জাতিভেদ প্রথা অন্য জাতীয় ব্যক্তির সহিত ভোজ্যান্নতা নিবারণ ও তন্নিবন্ধন সমুদ্রযাত্রা নিষেধ করিয়া দেশের উন্নতির পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত দেয়। মনের মিল হইলেও জাতিভেদ প্রথা নিবন্ধন লোকে পরস্পর আদান প্রদান করিতে সক্ষম হয় না, ইহা অল্প অসুখের কারণ নহে। যে পর্য্যন্ত না জাতিভেদ প্রথা ভারতবর্ষ হইতে উন্মূলিত হয়, সে পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের কোন প্রকার উন্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই।

যাঁহারা জাতিভেদ প্রথা রাখিতে চাহেন কিন্তু পরিবর্ত্তিত আকারে রাখিতে চাহেন, তাঁহারা বলেন যে জাতিভেদ প্রথা থাকিলেই যে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর ভোজ্যান্নতা ও সমুদ্র যাত্রা থাকে না এমত নহে; পূর্ব্বে ভারতবর্ষে জাতিভেদ ছিল অথচ সমুদ্র যাত্রা ও ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিদিগের সহিত পরস্পর ভোজ্যান্নতাও ছিল। পূর্ব্বে ভারতবর্ষে যেরূপ জাতি বিভেদ ছিল, সেই রূপ জাতি বিভেদ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য; জাতি বিভেদ একেবারে উঠাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে, বস্তুতঃ উহা একেবারে উঠাইয়া দিবার উপায়ও নাই। জাতিভেদ মনুষ্যের প্রকৃতিগত; সকল মনুষ্য সমান নহে। কেহ দরিদ্র, কেহ ধনী; কেহ বিদ্বান, কেহ মুর্খ। এই রূপ প্রভেদ চিরকালই থাকিবে। জাতি বিভেদ প্রথা কোন না কোন আকারে লোক সমাজে অবশ্য চিরকাল বিদ্যমান থাকিবে। বর্ত্তমান জাতি বিভেদ প্রথা উঠাইয়া দাও আর এক প্রকার জাতি বিভেদ প্রথা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিবে। ভারতবর্ষে যেরূপ জাতি বিভেদ প্রথা প্রচলিত আছে, সে রূপ প্রথা ইউরোপ খণ্ডে প্রচলিত নাই বটে, কিন্তু তথায় আর এক প্রকার জাতি বিভেদ প্রথা বিদ্যমান আছে। তথায় ধনী এক জাতি; দরিদ্র আর এক জাতি। এই দুই জাতির মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার ও আদান প্রদান

নাই। যখন জাতি-ভেদ প্রথা চিরকাল লোক সমাজে বিদ্যমান থাকিবে, তখন ভারতবর্ষে পূর্ব্ব কালের জাতি বিভেদ প্রথা অর্থাৎ ধর্ম্ম ও বিদ্যা মূলক জাতিবিভেদ প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা কর্ত্তব্য, নতুবা সকল প্রকার জাতি বিভেদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ধনমূলক জাতিবিভেদ প্রথা ভারতবর্ষ অধিকার করিবে। পূর্ব্ব কালে ভারতবর্ষে জাতি বংশগত ছিল কিন্তু যিনি শূদ্র বংশোদ্ভব হইয়া ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র ও বিদ্বান হইতেন, তিনি ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইতেন; যিনি ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব হইয়া অধার্ম্মিক, অসচ্চরিত্র ও মূর্খ হইতেন, তিনি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেন। এই সুপ্রথা দ্বারা ধর্ম্ম ও বিদ্যাকে বিশেষ উৎসাহ প্রদান করা হইত। এই সুপ্রথা ক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছিল কিন্তু একেবারে সম্পূর্ণ রূপে হয় নাই। এমন কি, আমাদিগের এক পুরুষ কি দুই পুরুষ পূর্ব্বে পান দোষ অথবা পরদারাভিগমন জন্য লোকে জাত্যন্তরিত ও অপাঙক্তেয় হইত। পূর্ব্বোক্ত অতি প্রাচীন কালের সুপ্রথা পূর্ণ আকারে পুনঃ প্রবর্ত্তিত হইলে লোক সমাজের প্রভূত উপকার সাধন হইবার সম্ভাবনা। স্বদেশীয় রাজা থাকিলে এপ্রকার সৎপ্রথা পুনঃ প্রচলনে বিশিষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া যাইত। কিন্তু যখন স্বদেশীয় রাজা নাই, তখন ধনী, মানী ও বিদ্বান সকলেই একত্রিত হইয়া এই বিষয় সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। জাতিভেদ প্রথা উক্ত প্রকারে শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন করিয়া লোক সমাজের বিশেষ উপকারী হয়। জাতিভেদ প্রথা কেবল ধর্ম্ম ও বিদ্যাকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক লোক সমাজের উপকার সাধন করে এমত নহে; দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষা করিয়া আর এক প্রকারেও লোক সমাজের উপকার সাধন করে। দেশে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ রক্ষিত না হইলে তাহার অমঙ্গলের সম্ভাবনা। এক্ষণে ইওরোপ খণ্ডের কোন কোন দেশে বিশেষ বুদ্ধিমান ব্যক্তির অভাব জন্য লোকে আক্ষেপ করিয়া থাকে। গ্যাল্‌টন সাহেব প্রভৃতি কোন কোন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা বলেন যে ঐ অভাব মোচন জন্য বুদ্ধিমান পুরুষের সহিত বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে তাহারদিগের সন্তানও বুদ্ধিমান হইবে। এই প্রকারে বুদ্ধিমান ব্যক্তির প্রবাহ দেশে চিরকাল রক্ষিত হইবে। উল্লিখিত পণ্ডিতেরা ইউরোপখণ্ডে এইরূপ প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার প্রস্তাব করেন কিন্তু আমাদিগের দেশে এই প্রথা অনেক দিন অবধি আছে। ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিরা নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি অপেক্ষা যে বুদ্ধিমান, তাহার সন্দেহ নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে অন্য জাতীয় ছাত্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য কুলোদ্ভব ছাত্রই অধিক। জাতিভেদ প্রথা বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের প্রবাহ দেশে রক্ষা করিয়া লোক সমাজের মঙ্গল সাধন করে; এবং ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ধর্ম্ম ও বিদ্যাকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক লোক সমাজের চরিত্র সম্বন্ধীয় দোষ নিবারণ ও ধর্ম্মোন্নতি সাধনের বিশেষ সহকারী হয়। জাতি বংশগত হইবে অথচ নিকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি জ্ঞানী ও ধার্ম্মিক হইলে উৎকৃষ্ট জাতিতে উন্নত হইবে এবং উৎকৃষ্ট জাতীয় ব্যক্তি অধার্ম্মিক ও মূর্খ হইলে স্বজাতি হইতে অধঃপাতিত হইবে, এইরূপ রীতি প্রচলিত থাকিলে জাতি বিভেদ প্রথার দোষ নিবারিত হইয়া তাহা হইতে কেবল শুভফল উৎপন্ন হইবে। জাতি বিভেদ প্রথা রাখা উচিত কিন্তু বর্ত্তমান জাতিভেদ প্রথার কিছুমাত্র সংস্কার আবশ্যক নাই এ কথায় আমরা সায় দিতে পারি

না। পিতৃ পিতামহের প্রতি ভক্তি জনিত রক্ষণশীল ভাব লোকসমাজের মঙ্গলকর কিন্তু যদি তাহা উন্নতি এবং সংস্কারের একান্ত প্রতিবন্ধক হয়, তাহা হইলে তাহা মঙ্গলকর নহে। বস্তুতঃ আমরা যে সংস্কারের প্রস্তাব করিতেছি, তাহাকে সংস্কার বলা যায় না; তাহা পিতৃ পিতামহের অতি শ্রদ্ধেয় পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করা মাত্র।

বেদান্ত-দর্শন।

পরিবর্ত্তন-দ্বারাই প্রকৃতি সজীব রহিয়াছে। আলোক, উত্তাপ, বল, যাহারা প্রকৃতির প্রধান কার্য্য-কারক, তাহারদের পরিবর্ত্তন দেখিলে চমকিত হইতে হয়। আলোকের স্পন্দন-বেগ এত যে, তাহার যদি রেণু-পরিমাণ ভারিত্ব থাকিত, তাহা হইলে তাহার প্রচণ্ড আঘাতে পৃথিবী রসাতল-গামী হইত। উত্তাপ, আকর্ষণ, ইত্যাদির প্রত্যেকের বিষয় বলিতে গেলে বিস্তর বাহুল্য হইয়া পড়ে; এক কথায় এই যে, উহারদের প্রত্যেকেই পরিবর্ত্তনের সহচর। পরিবর্ত্তনের ভাব দেখিয়াই যদি আশ্চর্য্য হইতে হইতেছে,তবে সেই প্রভূত পরিবর্ত্তনের মধ্যে অপরিবর্ত্তনীয়-ভাব দেখিলে কত না আশ্চর্য্য হইতে হইবে! ঘটনা-সকল পরিবর্ত্তন-শীল কিন্তু সেই পরিবর্ত্তনের নিয়ম সকল অপরিবর্ত্তনীয়। যে নিয়মে বৃক্ষ হইতে ফল পড়িতেছে, সেই নিয়মে সৌর জগৎ চলিতেছে; যুগযুগান্তর পূর্ব্বে যে নিয়ম মানব-শূন্য জীব-শূন্য তরু-লতা-শূন্য পৃথিবীর পরিভ্রমণ-মার্গ চিহ্নিত করিয়া দিয়াছিল,—সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া এই মানব-পূর্ণ জীব-পূর্ণ ধন-ধান্য-পূর্ণ পৃথিবী আজিও সেই পথে পরিভ্রমণ করিতেছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ঘটনার নিয়ম অগ্রে না ঘটনা অগ্রে? কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ব্যতিরেকে [illegible] না ঘটিতে পারে না; সুতরাং নিয়মের পূর্ব্বে ঘটনা ঘটিতে, পারে না। কিন্তু যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহার নিয়ম যখন অদ্য স্থির-নিশ্চিত আছে, তখন অবশ্যই মানিতে হইবে যে, ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে তদীয় নিয়ম বর্ত্তমান থাকা আবশ্যক। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে যখন নিয়মকে দেখা যায়, তখন হঠাৎ মনে হয় যে, ঘটনা অবলম্বন করিয়াই নিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে, ঘটনার উপরেই নিয়ম নির্ভর করিতেছে। আমরা প্রথমে ঘটনা প্রত্যক্ষ করি, পশ্চাৎ নিয়ম আবিষ্কার করি; সুতরাং আমারদের দৃষ্টিতে অগ্রে প্রাকৃতিক ঘটনা পশ্চাতে প্রাকৃতিক নিয়ম। কিন্তু যখন আমরা ঘটনার মূলে তদীয় নিয়ম থাকিবার আবশ্যকতা জ্ঞানে উপলব্ধি করি, তখন আমারদের সে ভ্রম তিরোহিত হয়; তখন আমরা এইরূপ স্থির নিশ্চয় করি যে, ঘটনার উপরে নিয়ম নির্ভর করে না,প্রত্যুত নিয়মের উপরেই ঘটনা নির্ভর করে। ইহার উদাহরণ—মনে কর একটি গোলা ক হইতে খ খ হইতে গ এই দিকে চলিতেছে। যখন ক হইতে খ এই দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখনই জানা যাইতেছে যে গোলাটি যদি অন্য কোন প্রকারে বাধিত না হয়,তবে যথা-কালে খ হইতে গ স্থলে উপনীত হইবে। গোলাটি নিয়তই স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে, কিন্তু ক হইতে খ এই দিকে চলিবার যে নিয়মটি, তাহা ক্রমাগতই অপরিবর্ত্তনীয় রহিতেছে। গোলাটি খ হইতে গ স্থলে উপনীত হইবার পূর্ব্বে "উহাকে ঐ স্থানে উপনীত হইতে হইবে" এ নিয়মটি অবশ্য বর্ত্তমান ছিল; ক হইতে খ স্থলে উপনীত হইবার পূর্ব্বেও সেই নিয়মটি বর্ত্তমান ছিল। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, গোলাটির নিয়ত-

স্থান-পরিবর্ত্তনের সম্বন্ধে উক্ত স্থান-পরিবর্ত্তনের ঐ যে নিয়মটি, তাহা অপা[illegible]র্ত্তনীয়। ঐ অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মটি অবলম্বন করিয়াই গোলাটি স্থান পরিবর্ত্তন করিতেছে।

নিয়ম নিয়মিত ঘটনার পূর্ব্ব-হইতে বর্ত্তমান। সুতরাং নিয়মিত ঘটনা যখন ছিল না, তখন নিয়ম ছিল। কিন্তু নিয়ম কোন বস্তু-বিশেষ নহে। সুতরাং "নিয়ম ছিল" বলিলেই এইরূপ বুঝায় যে উহা কোন বস্তুকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান ছিল। সে বস্তু কি? ইহাই জিজ্ঞাসা। ঘটনা বিশেষ-বিশেষ, নিয়ম তাহারদের সকলের সম্বন্ধে সাধারণ; সুতরাং বিশেষ বিশেষ বস্তুর সম্বন্ধে যে বস্তু সাধারণ, তাহাই নিয়মের ভিত্তি ভূমি স্বরূপ; বিশেষ বিশেষ বস্তু সকলের সম্বন্ধে সাধারণ বস্তু কি? না জ্ঞান-পদার্থ। আমি একবার হস্তি দেখিতেছি, আর একবার অশ্ব দেখিতেছি, আর একবার আর কিছু দেখিতেছি; প্রত্যেককে আর আর সমস্ত বস্তু হইতে বিশেষ করিয়া দেখিতেছি। কিন্তু এক আমি হস্তিকে দেখিতেছি, আর এক আমি অশ্বকে দেখিতেছি, ইহা হইতে পারে না; একই আমি হস্তি অশ্ব প্রভৃতিকে দেখিতেছি। সুতরাং হস্তি অশ্ব প্রভৃতি বস্তু সকল বিশেষ-বিশেষ, জ্ঞান-পদার্থ বা "আমি" তাহারদের সম্বন্ধে সাধারণ। নিয়ম বিশেষ-বিশেষ ঘটনার সম্বন্ধে সাধারণ, সুতরাং যে বস্তু সাধারণ তাহাই নিয়মের অবলম্বন-স্থল, জ্ঞান পদার্থই নিয়মের অবলম্বন-স্থল। বিশেষ বিশেষ বস্তু পরস্পরের সম্বন্ধে পরিবর্ত্তনশীল; নিয়ম তাহারদিগের সম্বন্ধে অপরিবর্ত্তনীয়; সুতরাং কালের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয় না এমন যে জ্ঞান পদার্থ, তাহাই নিয়মের অবলম্বন স্থল। পুনশ্চ যাহা নিয়মের অধীন বা নিয়মের উপরে নির্ভর করিতেছে, তাহার উপরে নিয়ম নির্ভর করিতেছে, একথার অর্থ নাই। সুতরাং স্বাধীন বস্তুই নিয়মের অবলম্বন-স্থল। জ্ঞান পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই স্বাধীন বস্তু হইতে পারে না; আপনাকে জানা-সহকারে থাকা, আপনার জ্ঞান-শক্তি সহকারে থাকা, আপনার শক্তিতে আপনি থাকা, এই যে স্বাধীন অস্তিত্ব, ইহা জ্ঞান ভিন্ন আর কোন বস্তুতেই থাকিতে পারে না। অতএব "স্বাধীন-বস্তুই নিয়মের অবলম্বন-স্থল" এই মাত্র বলিলেই প্রকারান্তরে বলা হয় যে জ্ঞান-বস্তুই নিয়মের অবলম্বন-স্থল। অতএব নিয়মিত ঘটনার পূর্ব্বে নিয়ম বর্ত্তমান ছিল ইহা বলিলে এইরূপ বুঝাইবেই বুঝাইবে যে, উহা জ্ঞান-পদার্থকে আশ্রয় করিয়াই বর্ত্তমান ছিল। অতএব এক মাত্র অদ্বিতীয় মূল জ্ঞানেতেই মূল নিয়ম-সকল পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান; জগতের নিয়ম-সকল পরমাত্মার জ্ঞানেতেই বর্ত্তমান; এ বিষয়ে আর সংশয় হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন যে, নিয়ম জানিলেই জ্ঞানের যথেষ্ট চরিতার্থতা হইতে পারে, নিয়মের অবলম্বনস্থল জানা বাহুল্য। যথা,—"প্রতি দিন সূর্য্য-উদয়াস্ত হইবে" এই নিয়মটি জানিয়াই নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে; উক্ত নিয়মের অবলম্বন-স্থলকে জানিলে তাহা হইতে অধিক কি আর জানা হয়? ইঁহারদের প্রতি বক্তব্য এই যে, তোমরা নিয়মের ভক্ত, অথচ নিয়মের মূলকে দেখিতে পার না; যে শাখায় বসিয়া আছ তাহারই মূলোচ্ছেদ করা তোমারদের সংকল্প। তোমরা বলিতেছ যে, শাখা হইতেই আমরা ফল পাইতেছি, ফুল পাইতেছি, সকলই পাইতেছি; মূল হইতে আমরা কি পাইতেছি? অতএব মূল থাকিলেই বা কি আর না থাকিলেই বা কি। শাখা ত আছে—তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

কিন্তু বল দেখি, মূল হীন নিয়ম অপেক্ষা মূল-যুক্ত নিয়ম শ্রদ্ধেয় কি না! নিয়মের প্রতি তোমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে—ইহা আমি স্বীকার করিলাম; কিন্তু নিয়মের প্রতি সেই তোমার অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-বশতই কি তুমি নিয়মকে তদীয় মূল হইতে পৃথক্ করিতে (অর্থাৎ নির্ম্মূল করিতে) ইচ্ছা করিতেছ? এই যে নূতন-বিধ শ্রদ্ধা, যাহা স্বীয় বিষয়ের মূল-দ্বেষী, তাহাকে সমূলক বলিব না অমূলক বলিব? যদি সমূলক নিয়ম অপেক্ষা অমূলক নিয়ম শ্রেয়স্কর হয়, তবে সমূলক শ্রদ্ধা অপেক্ষা অমূলক শ্রদ্ধা তেমনিই শ্রেয়স্কর, তাহাতে আর সংশয় নাই।

ইতিপূর্ব্বে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়াই নিয়ম বর্ত্তমান আছে। কিন্তু নিয়মকে জ্ঞানের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিলেই বা তাহাতে ফল কি, এবং বিযুক্ত করিয়া দেখিলেই বা তাহাতে ক্ষতি কি, ইহা বুঝিতে না পারিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে নিয়ম জ্ঞানমূলক হইলেই বা কি না হইলেই বা কি, তদ্রূপ নিষ্ফল বিষয়ে অত প্রমাণ প্রয়োগ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। অতএব নিয়মকে জ্ঞানের সহিত যুক্ত করিয়া দেখাতে কোন ফল আছে কি না তাহা একবার স্থির চিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখা যাউক। জ্ঞানের সাফল্য বা নিষ্ফলতার উপরে বেদান্তের সাফল্য এবং নিষ্ফলতা নির্ভর করিতেছে।

নিয়ম কাহার? জ্ঞানের না অজ্ঞানের? ইহার উত্তর এই যে, জ্ঞানই নিয়মের ভিত্তিভূমি। ইহার প্রমাণ এই যে, "নিয়মেরই অধীন—ঘটনা; ঘটনার অধীন নিয়ম নহে" নিয়মের এই যে স্বাধীন-ভাব, ইহা স্বাধীন বস্তুরই পরিচয় দেয়। নিয়মের ব্যাপক-ভাব ব্যাপক বস্তুরই পরিচয় দেয়। নিয়মের অপরিবর্ত্তনীয়তা অপরিবর্ত্তনীয় বস্তুরই পরিচয় দেয়। জ্ঞান-বস্তু ভিন্ন আর কোন বস্তুরই স্বাধীনতা হইতে পারে না, জ্ঞান-বস্তু ভিন্ন আর কোন বস্তুরই ব্যাপকতা হইতে পারে না, চলাচল জগতের মধ্যে জ্ঞান বস্তুই নিশ্চল। অতএব স্বাধীনতা ব্যাপকতা এবং অপরিবর্ত্তনীয়তা, নিয়মের এই যে লক্ষণ-ত্রয়, ইহার সমষ্টি জ্ঞানপদার্থ ভিন্ন আর কোন পদার্থেই পাওয়া যাইতে পারে না। এই রূপ প্রমাণ দ্বারা এই রূপ সিদ্ধান্ত হয় যে নিয়ম জ্ঞানেতেই বদ্ধমূল রহিয়াছে। সত্যাসত্যের মীমাংসা উপলক্ষে প্রমাণ প্রয়োগ করা হইল; এক্ষণে ভাল মন্দের বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

অত্রি সংহিতা।

হিন্দুদিগের সমস্ত ক্রিয়া কলাপ যে শাস্ত্রের বিধি অনুসারে সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহার নাম ধর্ম্মশাস্ত্র বা ধর্ম্ম-সংহিতা; তাহাকেই স্মৃতি শাস্ত্র কহে। এই ধর্ম্ম-সংহিতা বিংশতি সংখ্যায় * বিভক্ত। যে যে ঋষি প্রণীত যে যে ধর্ম্ম-সংহিতা, তাহা সেই সেই নামে প্রসিদ্ধ আছে, যথা—মনুপ্রণীত ধর্ম্ম-সংহিতা মনুসংহিতা, অত্রি প্রণীত ধর্ম্ম-সংহিতা অত্রি-সংহিতা, বিষ্ণু প্রণীত ধর্ম্ম-সংহিতা বিষ্ণু সংহিতা, ইত্যাদি।

এই সকল সংহিতার মধ্যে মনুসংহিতা অনেক প্রকারে অনেক বার অনুবাদিত ও প্রচারিত হইয়াছে, অন্যান্য সংহিতার অনুবাদ দৃষ্ট হয় না, অথচ সেই সেই সংহিতায় কোন্ কোন্ ধর্ম্মের কি প্রকার বিধি

---

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
* মন্বত্রি বিষ্ণু হারীত যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽংগিরাঃ।
৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪
যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়ন বৃহস্পতী। পরাশরো ব্যাস
১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০
সংখ লিখিতা দক্ষ গোতমৌ সাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রযোজকাঃ।

বিধান আছে, তাহা সাধারণের জানা আবশ্যক, এই জন্য অত্রি প্রভৃতি ধর্ম্ম সংহিতার ভাব অনুবাদে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

বেদবেত্তা, ও সর্ব্ব শাস্ত্র বিধিজ্ঞ অত্রি ঋষি অগ্নিহোত্র সমাপন করিয়া উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে মুনিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক কহিলেন, ভগবন্! সর্ব্ব লোকের হিতের নিমিত্ত কর্ত্তব্য বিধি আমারদিগের নিকট ব্যক্ত করুন। অত্রি কহিলেন, মুনিগণ! তোমরা বেদাদি সর্ব্ব শাস্ত্রের তত্ত্ব অবগত আছ, অতএব আমার নিকট তোমরা যে প্রশ্ন করিলে, তদ্বিষয়ে আমি যাহা কিছু দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তৎসমুদায় তোমারদিগকে কহিব। ইহা বলিয়া অত্রি সর্ব্ব-তীর্থ-জল স্পর্শ পূর্ব্বক সকল দেবতাকে প্রণাম করত সূক্ত সকল জপ করিয়া চতুর্ব্বর্ণের কর্ত্তব্য বিষয়ে এই শাস্ত্র কল্পনা করিলেন।

যাহারা পাপে অনুরক্ত ও যাহারা ধর্ম্মতঃ পতিত, এই শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া তাহারা সকলেই পাপ হইতে মুক্ত হয়, অতএব ইহা বেদবেত্তাদিগের যত্নে অধ্যয়ন করা ও সচ্চরিত্র শিষ্যদিগকে ধর্ম্মত উপদেশ করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু অকুলীন, অসচ্চরিত্র, জড়, শূদ্র, শঠ ও অব্রাহ্মণকে দান করা কর্ত্তব্য নহে।

যিনি একটি মাত্র অক্ষর উপদেশ দেন, তিনিও গুরু; পৃথিবীতে এমন কোন বস্তু নাই, যাহা গুরুকে দিয়া শিষ্য সেই ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। একাক্ষর দাতা গুরুকেও যিনি অবমাননা করেন, তিনি শত শত বার কুক্কুর ও চণ্ডাল যোনি প্রাপ্ত হয়েন। যে ব্যক্তি বেদাদি শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহাকে অমান্য করে, সে সদ্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়। যিনি স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি দূরে অবস্থিত হইলেও স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান জন্য লোকের প্রিয় হয়েন।

যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ও তপস্যা এই সাতটি ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম বৃত্তি। যজন, দান, অধ্যয়ন, তপস্যা, অস্ত্র ধারণ ও প্রজা রক্ষণ এই ছয়টি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম বৃত্তি। দান, অধ্যয়ন যজন এই তিনটি বৈশ্যের স্বধর্ম্ম বৃত্তি। বার্ত্তাবহন, দ্বিজ শুশ্রূষা ও কারুকর্ম্ম এই তিনটি শূদ্রের স্বধর্ম্ম বৃত্তি। এই চারি বর্ণের ধর্ম্ম ব্যক্ত করিলাম, বর্ণ চতুষ্টয় এই রূপ স্বস্বধর্ম্মে অবস্থিতি করিলে বহু মান প্রাপ্ত হইয়া পরম গতি লাভ করেন।

যাহারা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরধর্ম্মে অবস্থিতি করে, রাজা তাহারদিগকে যথাযোগ্য দণ্ড প্রদান করিয়া স্বর্গ ভোগ করেন। স্বীয় ধর্ম্মে অবস্থিত শূদ্রেরও স্বর্গ ভোগ হয়, অতএব সুরূপা পর কামিনীর ন্যায় পরধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেক। শূদ্র হইয়া যিনি জপহোম-পরায়ণ হয়েন, রাজা তাঁহাকে বধ করিবেন, নতুবা জল যেমন অগ্নি নির্ব্বাণ করে, সেই রূপ সেই শূদ্র রাজা বিনাশ করে। প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন, বিক্রেয় বিক্রয়, ও যাজন এই চারিটি কর্ম্ম করিলে ক্ষত্রিয় বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েন, আর মাংস, লাক্ষা ও লবণ বিক্রয় করিলে ক্ষত্রিয় সদ্য সদ্যই পতিত হয়েন। তিন দিবস দুগ্ধ বিক্রয় করিলে ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েন। যে গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন বা ব্রতাচরণ না করিয়া ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করে, রাজা সেই গ্রামের লোককে বধরূপ দণ্ড প্রদান করিবেন। যে রাজ্যে জ্ঞানীদিগের ভোগ্য বস্তু অজ্ঞানীরা ভোগ করে, সে রাজ্যে অনাবৃষ্টি ও মহৎ ভয় উপস্থিত হয়। যে স্থানের রাজা সর্ব্ব শাস্ত্র-বিশারদ ও বেদ-পারগ ব্রাহ্মণকে সম্মান করেন, সেই স্থানেই যথা-

কালে সুবৃষ্টি হইয়া থাকে। তিন লোক, তিন বেদ, তিন আশ্রম, তিন অগ্নি এই সকলের রক্ষার নিমিত্তে ব্রাহ্মণের সৃষ্টি হইয়াছে, অতএব যে ব্রাহ্মণ উভয় সন্ধ্যাকালে ঈশ্বরে মনঃ সমাধান পূর্ব্বক মৌন-ব্রত অবলম্বন করেন, তাঁহার সহস্র বৎসর স্বর্গ ভোগ হয়। যে রাজা এই প্রকার গুণ দোষ পরীক্ষা করেন, তাঁহার যশঃ, স্বর্গ, রাজ্য ও ধন বৃদ্ধি হয়। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়-পূর্ব্বক ধন-বৃদ্ধি, অপক্ষপাত, রাজ্য রক্ষা রাজাদিগের এই পাঁচটি যজ্ঞ। রাজারা প্রজাপালন করিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হয়েন, ব্রাহ্মণেরা সহস্র যজ্ঞ করিয়াও সে পুণ্য লাভ করিতে পারেন না।

বর্ণ-ভেদ প্রকরণ।

বৈদিক ঋষি ও পুরোহিত বংশ কি প্রকারে ক্র[illegible] স্বতন্ত্র শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণ উপাধি [illegible]াভ করিয়াছিলেন, তাহা ইতি পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহারা নিয়ত শাস্ত্রানুশীলন হেতু মার্জ্জিত বুদ্ধি ও অর্জ্জিত বিদ্যা বলে আর্য্য সমাজে সহজেই যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পদবী প্রাপ্ত হইয়া সকলের মাননীয় হইয়াছিলেন, ইহা অনায়াসেই অনুভব করা যাইতে পারে। সেই উন্নত পদবী রক্ষার্থে এবং আপনাদিগের ক্ষমতা,প্রতিপত্তি ও সামাজিক অধিকার বিস্তার করিবার জন্য তাঁহারা যে কি পর্য্যন্ত যত্নশীল ও কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন, সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রই তদ্‌বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

আধুনিক হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্ব কার্য্যে ব্রাহ্মণকে অকাতরে দান করিবার বিষয়ে যে উপদেশ ও অনুশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায়, বৈদিক ঋষিগণ ঋগ্বেদের দান-স্তোত্র সকলে তাহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। ঐ সকল স্তোত্রে ঋষি ও পুরোহিতগণকে অর্থ দানের অশেষবিধ ফল বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল ভূপতি বেদোদিত মহা যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান দ্বারা পুরোহিত বর্গ ও বৈদিক কবিগণকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিতেন, ঋষিগণ তাঁহাদের প্রশংসা সূচক স্তোত্র সকল রচনা করিয়া সর্ব্বত্র তাঁহাদের যশ ঘোষণা করিতেন। সেই সকল স্তোত্র দান-স্তুতি নামে খ্যাত আছে। আর যাহারা বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ, অথবা পুরোহিতগণকে অর্থ দানে কৃপণতা করিত,তাহাদের যথেষ্ট নিন্দাবাদ ও অনেক স্থলে শাপান্ত করিতেও বৈদিক কবিগণ ত্রুটি করিতেন না। এই রূপে বৈদিক সময় হইতেই ব্রাহ্মণগণ প্রশংসার প্রত্যাশা ও নিন্দার ভয় প্রদর্শনে আর্য্য ভূপালগণকে অনেকাংশে আপনাদিগের আয়ত্তাধীনে আনিয়া তাহাদিগের নিকট নিয়ত বিপুল অর্থ উপার্জ্জন এবং তদ্দ্বারা স্বচ্ছন্দে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এই বিষয়ে বহুতর প্রমাণ বেদে দৃষ্ট হয়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১০৭ সূক্তে দান শীলতার গৌরব, বিবিধ দানের ফল, এবং দাতার প্রশংসা এই রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে—যথা, "দাতাগণ এই তমোময় পৃথিবীর জ্যোতিঃ স্বরূপ, তাঁহারাই এই ধরাতলের তমোময় আবরণকে অবসৃত করিয়া দেন। দান কর্ত্তা ঊর্দ্ধে আকাশোপরি বাস করেন, অশ্ব দাতা সূর্য্যের সহবাস লাভ করেন, সুবর্ণ দাতা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হন, এবং বস্ত্র দাতা দীর্ঘ জীবী হয়েন। যে দান দেবতার প্রীতিকর, তাহা কুণ্ঠিত চিত্ত হইতে আসিতে পারে না; অনুদার চিত্ত ব্যক্তি কিছুই দেয় না, আর অনেক দাতা আছে, যাহারা কেবল নিন্দার ভয়ে দান করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রকৃত দাতা সে সকলের অগ্রগামী ও সকলের নেতা হয়। যিনি সর্ব্বাগ্রে দান করেন [illegible]হাকেই আমি মনুষ্যের রাজা

বলিয়া মানি। যে ব্যক্তি স্বীয় পুণ্য ক্রিয়া সমাপনান্তে তৎসম্পূর্ণতা সাধন জন্য অগ্রে দান করেন, তাঁহাকেই লোকে ঋষি, ব্রহ্মা, উদ্গাতা ও আধ্যায়িক বলিয়া জানে। দানে গো, অশ্ব, রজত, কাঞ্চন প্রাপ্তি হয়, তাহাতে আমাদের জীবন স্বরূপ অন্ন লাভ হয়, জ্ঞানী লোক দান শীলতাকেই আপনার বর্ম্ম স্বরূপ করেন। বদান্য ব্যক্তিগণ বিপদাপন্ন অথবা মৃত্যু মুখে পতিত হন না। তাঁহারা সমগ্র পৃথিবী ও স্বর্গ লাভ করেন। তাঁহারা সুরম্য আবাস, সুবেশা পত্নী, এবং সুমধুর পানীয় লাভ করেন (১)। দানশীল ব্যক্তির জন্য দ্রুতগামী অশ্ব রক্ষিত হয় এবং উজ্জ্বল বর্ণা নারী তাঁহারই হয়, তাঁহার গৃহ দেব-প্রাসাদের ন্যায় সুসজ্জিত এবং কমল শোভিত সরোবরের ন্যায় সুদৃশ্য। তিনি যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাভব করেন। হে দেবগণ! তোমরা উদার চরিত্র দানশীল ব্যক্তিকে সংগ্রামে রক্ষা কর"।

এই প্রকার সূক্ত সকলের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ আপনাদের উপকারার্থে সকলকেই দানশীল হইবার জন্য উত্তেজিত করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতেন। যে সকল ভূপতি এবং উদার চরিত্র লোক ব্রাহ্মণগণকে অজস্র দানে পরিতোষ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের যশ-কীর্ত্তন বেদের অনেক স্থানে সংরক্ষিত রহিয়াছে। তন্মধ্যে দুই একটি উদাহরণ এই স্থানে প্রকটিত হইল। যথা—

"দেবদত্ত-পৌত্র পিজবন-সুত সুদাঃ হইতে দুই শত গো এবং অশ্ব যোজিত-দুই রথ প্রাপ্ত হইয়া আমি গৃহ পরিক্রমকারী পুরোহিতের ন্যায় যশ-ঘোষণা করিয়া পরিভ্রমণ করিতেছি। ঋগ্বেদ ৭ মণ্ডল ১৮ সূক্ত।

কুরয়ান পুত্র পাকস্থামা আমাকে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী এক অশ্ব প্রদান করিয়াছিলেন। পাকস্থামা অন্ন বস্ত্র বল ও জীবন দান করেন। আমি তাঁহাকে চতুর্থ উদার চরিত্র দাতা বলিয়া প্রশংসা করি। অষ্টম মণ্ডল-৩-২১।

"তুর্ব্বসু শত শত অশ্ব রূপ ধন দান করিয়াছেন, এ জন্য তাঁহার প্রশংসা প্রচার করিতেছি। কণ্ব-পুত্রের স্তোত্র বলে প্রিয়মেধ যে ষষ্টি সহস্র শুদ্ধ গো প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা আমি (ঋষি) তাড়াইয়া লইয়া যাইতেছি; ইহাতে বৃক্ষ সকলও আমার আগমনে আনন্দিত হইয়া কহিতেছে "ইহাঁরা প্রভূত গো প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাঁরা অসংখ্য অশ্ব লাভ করিয়াছেন।" অষ্টম মণ্ডল-৩-১৯।

হে অশ্বিনদ্বয়! তোমরা দেখ, চেদিবংশোদ্ভব কশু আমকে এক শত উষ্ট্র এবং দশ সহস্র গো দান করিয়াছেন। প্রজাগণ ইহাঁর পদানত, কোন ব্যক্তি দান শক্তিতে ইহাঁর তুল্য নহে। অষ্টম মণ্ডল-৫-৭।

যাহারা বৈদিক ক্রিয়ানুষ্ঠান করিত না অথবা পুরোহিত ও ঋষিগণকে অর্থ দান করিত না, তাহাদের সম্বন্ধে বৈদিক কবিগণ কি প্রকার ভাবোক্তি করিয়া গিয়াছেন, তাহার কএকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

ইন্দ্র কেবল ক্রিয়াবান ও উদার স্বভাব ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদান করেন, তিনিই ঈশ্বর এবং অপ্রতিহত শক্তি। কবে ইন্দ্র ক্রিয়াহীন ব্যক্তিকে ক্ষুম্পের ন্যায় বিনষ্ট করিবেন? কবে তিনি আমাদের স্তোত্র শ্রবণ করিবেন। প্রথম মণ্ডল-৮৪-৭।

হে ইন্দ্র! আমাদের স্তোত্র সকল তোমাকে আনন্দিত করুক। হে বজ্রিন্! আমাদিগকে ধন প্রদান কর, ব্রহ্ম-দ্বেষ্টাকে বিনষ্ট কর। যে কৃপণ ব্যক্তি কিছু দান

(১) এই স্থলে প্রাচীন আর্য্য সমাজের অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাসও প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে।

না করে, তাহাকে পদাঘাত দ্বারা বধ কর। অষ্টম মণ্ডল-৫১-১।

হে মিত্রা বরুণ! যে ব্যক্তি তোমাদের উদ্দেশে অভিষবণ করে না, সে আপনার হৃদয়কে জরজরীভূত করে, কিন্তু ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপনার দানশীলতায় তোমাদের অনুগ্রহ লাভ করে। প্রথম মণ্ডল ১২২-৯।

যাহারা হোমাদি অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের সকলকে বিনষ্ট কর। আমাদিগকে ধন দান কর। বিপ্র সেই ধনের প্রত্যাশা করে। প্রথম মণ্ডল ১৭৬-৪।

যে ব্যক্তি দানে পরাঙ্মুখ, তাহাকে দান করিবার প্রবৃত্তি দেও। হে পূষন্! কৃপণের কঠিন হৃদয়কে কোমল কর। যে সকল পন্থা দ্বারা আমরা আহার্য্য প্রাপ্ত হই, তাহা মুক্ত করিয়া দেও। আমাদের শত্রু বিনাশ কর, যজ্ঞ সকল সফল কর। কৃপণ ব্যক্তির হৃদয়কে শলাকা দ্বারা বিদ্ধ কর এবং তাহা[illegible]গকে আমাদের বশীভূত করিয়া দেও। ৬ মণ্ডল ৫৩-৩।

শিখ সম্প্রদায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১৭৯৫ শকের চৈত্র মাসের পত্রিকায়, ২৫১ পৃষ্ঠায় শিখ ধর্ম্মের সংস্থাপক গুরু নানকের জীবন চরিত বিবৃত হইয়াছে। অতএব তাহার পুনরাবৃত্তি করা এখানে নিষ্প্রয়োজন।

নানক স্বীয় পুত্রগণকে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে অযোগ্য মনে করিয়া, ক্ষত্রিয় বর্ণের ত্রেহন কুলোদ্ভব লেহানা নামক এক ব্যক্তিকে তাঁহার উত্তরাধিকারী পদে অভিষিক্ত করিয়া গিয়াছিলেন। লেহানা নান[illegible] একজন চিরানুগত শিষ্য ছিলেন। নানক তাহাকে [illegible] নিগূঢ় তত্ত্ব সকলে দীক্ষিত করিয়া তাঁহাকে সন্ন্যাসীর পবিত্র বেশ পরিধান করাইয়া, [illegible]নের চিহ্ন স্বরূপ "অঙ্গদ" * নামটি প্রদান করিয়াছিলেন। ইনি শিখদিগের নিকট এই নামেই পরিচিত। লাহোরান্তর্গত বিতস্তা নদী তীরে অবস্থিত খান্দুয়া নামক গ্রামে গুরু অঙ্গদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার জীবনে কোন গুরুতর কার্য্য সংসাধিত হয় নাই। নানকের যে ধর্ম্ম মত ছিল, ইনি তাহাই শিক্ষা দিতেন ও গ্রন্থ নামক শিখদিগের ধর্ম্ম পুস্তকের কতকগুলি অধ্যায় ইঁহারই দ্বারা বিরচিত হয়। ভাসু ও দাতু নামক ইঁহার দুই পুত্র ছিল। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কাহাকেও তিনি গুরু পদে অভিষিক্ত করিয়া যান নাই। ১৬০৯ শকতে তাঁহার মৃত্যু হইলে, ক্ষত্রিয় বর্ণের ভালে কুলোদ্ভব, অমরদাস নামক একজন ব্যক্তি তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন। ইনি দ্বাদশ বৎসর কাল গুরু অঙ্গদের নিকট সামান্য ভৃত্যের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে, যে তিনি স্বীয় প্রভুর পদ প্রক্ষালনার্থ প্রতিদিন তিন ক্রোশ পর্য্যটন করিয়া, বিতস্তা নদী হইতে জল আনয়ন করিতেন; এক দিবস রাত্রি কালে জল লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, পথি মধ্যে প্রবল ঝটিকা সমুত্থিত হওয়াতে, ঝঞ্ঝাবাত ও অন্ধকারে অন্ধীভূত হইয়া, দৈবক্রমে তাঁর পদদ্বয় স্খলিত হইল ও তিনি ভূমিতলে পতিত হওয়াতে তাঁহার হস্তস্থিত জলের কুম্ভটী চূর্ণ হইয়া গেল। ঐ স্থানের সন্নিকটে গুরু অঙ্গদের বাটীর সম্মুখে একজন তন্তুবায় বাস করিত। তন্তুবায় পতন শব্দে চমকিত হইয়া, কোথা হইতে শব্দটি আসিল, জানিবার জন্য তাহার ভার্য্যাকে উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিল। ঐ স্ত্রীলোকটি, গুরু অঙ্গদের ভৃত্যের দৈনিক কার্য্য ও অসাধারণ প্রভু সেবার বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিল। সে উত্তর করিল যে "নিরীহ অমরদাস বোধ করি পড়িয়া গিয়াছে। আহা! তাহার রাত্রেও নিদ্রা নাই দিবসেও বিশ্রাম নাই"। এই কথা গুরু অঙ্গদ অন্তরাল হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে অমরদাস তাঁহার নিয়মিত কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত আসিলে পর, অঙ্গদ তাহার প্রতি অসাধারণ দয়া প্রকাশ করিলেন ও তাহাকে বলিলেন "এত দিন তুমি অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়াছ, অদ্য হইতে বিশ্রাম সম্ভোগ কর"। অমরদাস, নানকের ধর্ম্মমত গুলি উৎসাহ ও উদ্যম সহকারে প্রচার করিয়া, অনেক ব্যক্তিকে তাঁহার শিষ্য করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগের সাহায্যে সাংসারিক প্রভুত্বও কিয়ৎ পরিমাণে স্থাপন ও কজরবাল নামক একটি গ্রাম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং নানকের পুত্র ধরমচাঁদ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত উদাসী সম্প্রদায়টি, শিখ সম্প্রদায় হইতে পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয় তৎকালে, উদাসী সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত প্রকৃত শিখ ধর্ম্মের মত বলি[illegible] [illegible]গণিত হইত না।

* সংস্কৃত ভাষায় অঙ্গ ও পারস্য ভাষায় খোদ শব্দ, এই উভয় মিশ্রিত হইয়া অঙ্গদ শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। "অঙ্গদ" "অঙ্গ খোদ" অর্থাৎ স্বীয় শরীর। পঞ্জাবী ভাষায় প্রায়ই এই রূপ মিশ্র ভাব দেখিতে পাওয়া যায়।

অমরদাসের একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। পুত্রের নাম মোহন ও কন্যার নাম মোহিনী। মোহিনী সাধারণ লোকের নিকট ভাইনি নামে পরিচিত। কথিত আছে এই কন্যাটির বিবাহ দিবার জন্য অমরদাস অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। শিখ গ্রন্থকারগণ এই ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; যেহেতু এই বিবাহ হইতে এমন একটি বংশ উৎপন্ন হয়, যাহার মধ্যে অনেকেই গুরু পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন ও যাহারদিগকে শিখেরা অদ্যাপি যার পর নাই ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। একজন ব্রাহ্মণ অমরদাসের প্রধান ভৃত্য ছিল। তিনি তাহাকে তাঁহার কন্যার জন্য একটি পাত্র অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ একটি সুযোগ্য পাত্র স্থির করিয়া, অমরদাসকে সংবাদ দিল। এতৎ সম্বন্ধে উভয়ে রাজপথে কথোপকথন হইতে লাগিল, অমরদাস ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বালকটি কত বড়"? এই সময়ে তাঁহাদিগের নিকট আর একটি বালক দণ্ডায়মান ছিল, তাহার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ব্রাহ্মণ উত্তর করিল "ঐ বালকটির ন্যায়"; অমরদাস তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি নেত্রপাত করিলেন ও তাহার নিকট নাম ধাম কুলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বালক উত্তর করিল, "আমার নাম রামদাস, আমি সংবংশজাত, সন্দি কুলোদ্ভব ক্ষত্রিয় সন্তান, গন্ধবাল গ্রামে আমার নিবাস"। অমরদাস ঐ বালকের পরিচয়ে অতীব সন্তুষ্ট হইয়া, স্বীয় ভৃত্য ব্রাহ্মণের মনোনীত পাত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া, নব পরিচিত বালকটিকে স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষ গত হওয়াতে যাঁহাদিগের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে, তাঁহারা বর্ত্তমান বর্ষের নিমিত্ত অগ্রিম মূল্য প্রেরণ করিয়া বাধিত করিবেন। অগ্রিম মূল্য অগ্রে প্রদান না করিলে সমাজের ক্ষতি করা হয়।

যাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য দ্বাদশ মাস অনাদায় আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বর্ত্তমান মাসের মধ্যে উহা পরিশোধ করিবেন। নতুবা সমাজ আর তাঁহাদের নিকট মাশুল দিয়া পত্রিকা প্রেরণে সমর্থ হইবেন না।

আগামী ৯ আষাঢ় সোমবার রাত্রি ৮ আট ঘণ্টার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ হইবেক।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজ
১ আষাঢ় ১৭৯৬ শক } শ্রীশ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
সম্পাদক।

আয় ব্যয়।

১৭৯৫ শকের চৈত্র ও ১৭৯৬ শকের বৈশাখ।

আয়	৫২৬৷৶১০
পূর্ব্বকার স্থিত ...	২৯৩।৶১০
সমষ্টি	৮২০ /
ব্যয়	৫৭৮
স্থিত	২৪২ /

আয়

ব্রাহ্মসমাজ	১১৩৸/
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২১৮৷৶
পুস্তকালয়	৪২৷/
যন্ত্রালয়	৯৬
গচ্ছিত	৬১৸৶১০
সমষ্টি	৫২৬৷৶১০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	১৭৯৷/
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	১৯৩।৶
পুস্তকালয়	৪৮৷
যন্ত্রালয়	৯৩৷
গচ্ছিত	৬৩৷/
সমষ্টি	৫৭৮

দান প্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫০
" শিবচন্দ্র নন্দী ...	১০
" হরিমোহন নন্দী ...	১০
" বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	৫
" হরচন্দ্র রায় ...	১
" মথুরামোহন সুর ...	২
" কৃষ্ণলাল মৈত্রেয় ...	৫
" রাখালরাজ রায় ...	১
" শ্রীনাথ মিত্র ...	৩
" কৈলাসচন্দ্র বসু ...	।৶
দানাধারে প্রাপ্ত	১৬।৶

শুভকর্ম্মের দান।

শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ...	[illegible]
	১১৩৸/

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয়। মূল্য ছয় আনা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য তিন টাকা। ডাকমাশুল বার্ষিক ছয় আনা। সম্বৎ ১৯৩১। কলিগতাব্দ ৪৯৭৫। ১ আষাঢ় রবিবার।
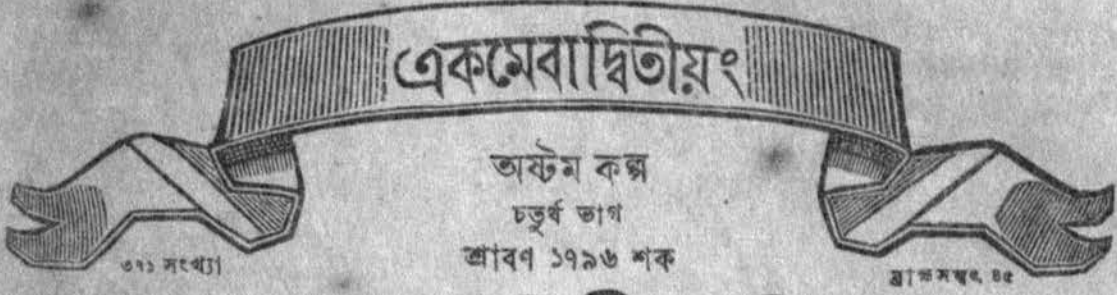
Registered No 58.

অষ্টম কল্প
চতুর্থ ভাগ
শ্রাবণ ১৭৯৬ শক
৩৭১ সংখ্যা
ব্রাহ্মসম্বৎ ৪৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবাএকমিদমগ্রআসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেক-মেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

প্রথম প্রপাঠক।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দেবাসুরা হবৈ যত্র সংযেতিরে। উভযে প্রাজাপত্যাস্তদ্ধ দেবা উদ্গীথমাজহ্রুরনেনৈ-ানভিভবিষ্যাম ইতি। ১।

'দেবাসুরাঃ' দেবাঃ দীব্যতের্দ্যোতনার্থস্য শাস্ত্রোদ্ভা-সিতা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ, অসুরাস্তদ্বিপরীতাঃ বিষয়বিষয়াসু প্রাণনক্রিয়াসু রমণাৎ স্বাভাবিক্যস্তমআত্মিকা ইন্দ্রিয়বৃ-ত্তয়ঃ, 'হবৈ' ইতিপূর্ব্ববৃত্তোদ্ভাসকৌ নিপাতৌ 'যত্র' যস্মিন্নিমিত্তে ইতরেতরবিষয়াপহারলক্ষণে 'সংযেতিরে' সংগ্রামং কৃতবন্তঃ। 'উভযে' দেবাসুরাঃ প্রজাপতের-পত্যানীতি 'প্রাজাপত্যাঃ' 'তৎ' তত্র নিমিত্তে 'হ' কিল 'দেবাঃ' 'উদ্গীথং' উদ্গীথভক্ত্যুপলক্ষিতমৌদ্গাত্রং কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোমাদি 'আজহ্রুঃ' আহৃতবন্তঃ 'অনেন' কর্ম্মণা 'এনান্' অসুরান্ 'অভিভবিষ্যাম' 'ইতি' এবম-ভিপ্রায়াঃ সন্তঃ। ১।

শাস্ত্রীয় ইন্দ্রিয় বৃত্তির নাম দেবতা ও স্বাভা-বিক ইন্দ্রিয় বৃত্তির নাম অসুর, এই উভয় দলের বিষয় অপহরণ জন্য পরস্পর যুদ্ধ হইয়াছিল, ইহারা উভয়েই প্রজাপতি হইতে উৎপন্ন, এই উপলক্ষে দেবতারা এই কর্ম্ম দ্বারা অসুরদিগকে পরাভব করিব, ইহা ভাবিয়া উদ্গীথ আহরণ করিয়াছিলেন। ১।

তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাঞ্চ-ক্রিরে, তং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুঃ, তস্মা-ত্তেনোভযং জিঘ্রতি সুরভি চ দুর্গন্ধি চ পাপ্মনা হ্যেষ বিদ্ধঃ। ২।

'তে' দেবাঃ 'হ' কিল 'নাসিক্যং' নাসিকায়াং ভবং 'প্রাণং' প্রাণদৃষ্ট্যা 'উদ্গীথং' উদ্গীথাক্ষরমোঙ্কারং 'উপাসাঞ্চক্রিরে' কৃতবন্তঃ, 'তং' নাসিক্যং প্রাণং 'হ' কিল 'অসুরাঃ' স্বাভাবিকা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ 'পাপ্মনা' অধ-র্ম্মাসঙ্গরূপেণ 'বিবিধুঃ' সংসর্গং কৃতবন্তঃ, 'তস্মাৎ' কার-ণাৎ 'তেন' ঘ্রাণেন প্রাণেন 'সুরভি চ দুর্গন্ধি চ' 'উভয়ং' 'জিঘ্রতি' লোকঃ 'হি' যস্মাৎ 'এষঃ' প্রাণঃ 'পাপ্মনা বিদ্ধঃ' ।২।

সেই দেবতারা নাসিকাস্থ প্রাণ দৃষ্টিতে উদ্-গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং অসুরেরাও সেই ঘ্রাণকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া-ছিল, সেই হেতু এই ঘ্রাণ দ্বারা সুরভি ও দুর্গন্ধি উভয়ই গৃহীত হইয়া থাকে, যেহেতু এই ঘ্রাণ পাপে বিদ্ধ হইয়া আছে। ২।

অথ হ বাচমুদ্গীথমুপাসাঞ্চক্রিরে, তাং হাসুরাঃ পাপ্মনা বিবিধুস্তস্মাত্তযোভযং ব-দতি সত্যঞ্চানৃতঞ্চ পাপ্মনা হ্যেষা বিদ্ধা। ৩।

অথ হেত্যাদি পূর্ব্ববৎ। ৩।

অনন্তর দেবতারা বাক্য দৃষ্টিতে উদ্গীথাক্ষর ওঙ্কারের উপাসনা করিয়াছিলেন, এবং অসুরেরাও সেই বাক্যকে পাপ দ্বারা বিদ্ধ করিয়াছিল, সেই